নাইমা বি রবার্ট

গ্লো আপ

(মুসলিম নারীদের প্রেরণার বার্তা)

অনুবাদ
মারইয়াম শারমিন

এক নজরে...

অনুবাদিকার উপলব্ধি ৭
লেখিকার ভাবাবেগ ৯
যাত্রা লগনে ১১
অধ্যায়-১: সব হারিয়ে আমি ১৭
অধ্যায়-২: আত্মপ্রকাশ মানে কী? ২৫
অধ্যায়-৩: জীবনপটে আত্মপ্রকাশের স্বরূপ ৩১
৩.১: নিজের জন্য নিজেকে প্রকাশ ৩৩
৩.২: স্বামীর জন্য নিজেকে প্রকাশ ৩৪
৩.৩: সন্তানদের জন্য নিজেকে প্রকাশ ৩৬
৩.৪: পরিবারের জন্য নিজেকে প্রকাশ ৩৬
৩.৫: স্বপ্নগুলোর জন্য নিজেকে প্রকাশ ৩৬
৩.৬: প্রভাবক বৃত্ত ৩৭
অধ্যায়-৪: কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন? ৪১
ধাপ-১: মনজিল ঠিক করুন ৪৫
ধাপ-২: ইতিবাচক হোন ৫৩
ধাপ-৩: শোকরগুজার হোন ৬৫
ধাপ-৪: হিম্মত রাখুন ৬৯
ধাপ-৫: স্রোতে গা ভাসান ৮১
ধাপ-৬: নিজের মতো থাকুন ৯৩
যাত্রা অন্তিমে ১০৭

* * *

অনুবাদিকার উপলব্ধি

সদ্য দ্বীনে ফেরা বোনদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার খুব লক্ষ করা যায়—আমি যেহেতু পর্দা করি, আমার জন্য সব না-জায়েজ! সাজগোজ করা যাবে না, বিনোদন নেওয়া যাবে না, বাহিরে খেতে যাওয়া কিংবা ঘোরাঘুরি করাও নিষিদ্ধ...

মাস ছয়েক পর, আচানক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ—এটা কে! রুক্ষ চুল, মলিন চেহারা, কালসেঁটে চোখ। অসম্ভব, এই মানুষটা কখনোই আমি হতে পারি না!

এবার তক্কে তক্কে থাকা শয়তান আমাদের মোক্ষম কানপড়া দেয়—স্রেফ দ্বীনে ফেরার কারণেই তোমার এমনটা হয়েছে। দেখেছো, ইসলামে কোনো আনন্দ নেই, তোমার নিজের বলতে কিছুই নেই, সব কিছুতেই শুধু বারণ আর বারণের ছড়াছড়ি। তাই দ্বীনে ফিরেছো তো মরেছো, বোঝো এবার ঠ্যালা।

কিছু করতে গেলেও আশপাশ থেকে আমরা তাচ্ছিল্য হাহাকার পাই—'ওমা, তুমি না পর্দা করো? এটা করো কেন? ওটা করো কেন?' একটা সময় পর আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। হাল ছেড়ে দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাবতে থাকি—দ্বীনে ফেরার জন্যই তাহলে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুইয়েছি।

একটা সহজ কথা বলি বোন। ইসলাম আপনাকে গায়রে মাহরাম থেকে নিজের সৌন্দর্য আড়াল করতে বলেছে; নিজের যত্ন নিতে, স্বামীর জন্য সাজতে বারণ করেনি। ইসলাম আপনাকে মাহরাম ছাড়া সফর করতে বাধা দেয়; কিন্তু বেড়াতে যাওয়া হারাম করেনি। ইসলাম আপনাকে হারাম থেকে বাঁচতে বলেছে; হালাল বিনোদন থেকে পালিয়ে বাঁচতে বলেনি। ইসলাম আপনাকে একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু নিজের আসল সত্তাকে মেরে ফেলতে বলেনি। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ আপনাকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন, রেখেছেন একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যও। এই দুনিয়াতে আপনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

লেখিকা নাইমা বি. রবার্ট-এর "শো-আপ" বইটি দ্বীনি বোনদের জন্য আশীর্বাদ-স্বরূপ। যারা নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না, একটা মুখোশের আড়ালে সবসময় নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, মনে হাজার স্বপ্ন, শখ থাকা সত্ত্বেও নানান অজুহাতে নিজেকে আড়াল করেন—তাদের জন্য বইটি অবশ্যপাঠ্য।

একজন নারীর সমস্যা, প্রতিবন্ধকতাগুলো আরেকজন নারীই তো ভালো বুঝবে, তাই না? লেখিকা সেই নারীয় দিকটার সমস্তটা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমে আপনার সমস্যা এবং প্রবণতাগুলো উল্লেখ করেছেন, তারপর সেসব থেকে মুক্তির পথও বাতলে দিয়েছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হলো, আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে লেখিকা খুলে খুলে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত, শারীরিক, মানসিক অবস্থা থেকে শুরু করে, পিতামাতা, স্বামী, সন্তানের সাথে সম্পর্ক; কোনোটাই বাদ দেওয়া হয়নি।

আমি আশা করছি, বইটি আপনাদের উপকারে আসবে, খানিকটা চিন্তার খোরাক জোগাবে। নিজের সত্যিকার সত্তাকে বাহিরে নিয়ে আসতে, সুখী-স্বাচ্ছন্দ্যের একটা জীবন উপভোগ করতে সহায়তা করবে বিইজনিল্লাহ। কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। আমার উদাত্ত আহবান—কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে, কালবিলম্ব না করে আমাকে অবগত করবেন ইন শা আল্লাহ।

প্রকাশকসহ, বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুকরিয়া জানাই, আপনাদের এন্তার সহায়তার জন্য। বিশেষ করে, বোন জান্নাতুল ফেরদৌস ফাইজা—যিনি কবিতাগুলো অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে অনেকখানি ভারমুক্ত করেছেন। বইটি থেকে যা সওয়াব হাসিল হবে, তা যেন প্রত্যেকের সদাকায়ে জারিয়া হিসেবে রব্বে কারীম কবুল করে নেন।

দুআর মুহতাজ
মারইয়াম শারমিন
maryaam.bm@gmail.com

লেখিকার ভাবাবেগ

গোড়াতেই আমার রব—আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি সেসব নেয়ামতের জন্য—যার দরুন বইখানি সোনালি আলোর মুখ দেখতে পেরেছে।

শুকরিয়া জ্ঞাপনের দ্বিতীয় সারিখানা বেশ লম্বা। এই সারিতে ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছেন—বাবা রবার্ট ম্যাকলারেন, বোন গুগু ম্যাকলারেন-অশুওকুঞ্জ; আরো আছে আমার সন্তানেরা—উবাইদ, আদম, মারইয়াম এবং আমানি। প্রত্যেকের অকৃত্রিম সহায়তা ও অজস্র উৎসাহের জন্য আজীবন ঋণী হয়ে থাকব।

বইটি নিয়ে কাজ করার সময় একের পর এক দীর্ঘ রাত জেগে থাকা এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতি সইবার জন্য জনাব মাইটলির প্রতি জানাচ্ছি হৃদয়ের উষ্ণ কৃতজ্ঞতা।

পুরো কাজের সময়টাজুড়ে যে বোনেরা আমার সাথে ছিলেন, তাদেরকেও অগুনতি ধন্যবাদ জানাই। এই মুহূর্তে তাদের নামগুলো কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতে চাই: লাইক্কা স্যানি, বারাকাহ হাসান, এলিশা দামালিতি এবং বাকি সবাই—যারা লেখার জন্য প্রতিদিন আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

আমার দলের নারী সদস্যরা, যারা কি না আমার লেখার প্রথম বেটা রিডার ছিলেন—হেন্দ হিজাযী, ফাতিমা মোকাদাম এবং রাহিমা অদুসোতকেও জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আমার এজেন্ট শেরি শাফরানকেও শুকরিয়া জানাই, সবসময় আমার পাশে থাকার জন্য, আমার পক্ষে লড়াই করার জন্য।

হারিস আহমেদ, কিউব প্রকাশনীর কর্ণধার; আমাকে ভরসা করার জন্য, আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইউসুফ স্মিথ, যে বিনা প্রতিদানে আমাকে সাহায্য করে গেছে নিরন্তর—তোমার নাম তো বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম! তোমার প্রতিও আমি অনেক ঋণী।

কিউব প্রকাশনীর সম্পাদক আসমা আনওয়ারকে ধন্যবাদ, পুরো বইটাতে এত সৌকর্যময় কাজ করার জন্য। কভার ডিজাইনার জান্নাত এবং যারা কভার বাছাইয়ে ভোট দিয়েছেন—সবাইকে অঢেল কৃতজ্ঞতা।

গোটা দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সে-সকল হাজার হাজার বোন, যারা আমার সাথে যুক্ত আছেন, আপনাদের বিরামহীন তাগাদা প্রতিনিয়ত আমাকে ট্রেনিং দিতে, ক্লাস নিতে অনুপ্রেরণা জোগায়। পাঠককুল, ছাত্রীরা, 'শো-আপ' সংঘের সদস্যরা—আপনারা এই বইখানাকে 'বই' আকারে নিয়ে আসতে তুমুল সহায়তা করেছেন। তাই বইটির পুরো কৃতিত্বই আপনাদের।

যাত্রা লণ্ডনে

"পুরোটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। দিনটা ছিল শনিবার, সকালবেলা। আমি তাকে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলাম। এরপর মাত্র দুসপ্তাহের ব্যবধানে, সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। বেশ বড়োসড়ো একটা ধাক্কা খেলাম—অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত! যা কি না আমাকে একদম ভেঙে চুরমার করে দিল।"

* * *

আমার প্রথম বড় কলেবরের গ্রন্থ *ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস,* স্বামী সুলাইমান হেনরিকে উৎসর্গ করেছিলাম। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলাম, *"আমার স্বামীর জন্য—যে হাওয়া আমার ডানা ঝাপটানোর কারণ।"*

অতীতের কথা ভেবে আমি এখনও অবাক হই যে, অর্পণনামার কথাগুলো তার জন্য কতটা জুতসই ছিল বলে।

খুব অল্প বয়সে আমরা বিয়ে করেছিলাম। এতটাই অল্প যে আমাদের অভিভাবকরা রীতিমতো লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। তারা একপ্রকার ধরেই নিয়েছিল যে, বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব নিতে আমরা পুরোপুরি অপারগ। তাদের মতে—প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিংবা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের আরো কয়েকটা বছর অন্তত অপেক্ষা করা উচিত।

কিন্তু আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কীভাবে কীভাবে যেন সবটা সামলেও নিয়েছিলাম ঠিক।

আমার মনে পড়ে, বিয়ের প্রথম দিনগুলোর কথা। দুটো অল্প বয়সি নও-মুসলিম ছেলে-মেয়ের সংসার-সংসার খেলা। সে বাহিরে কাজে যেত, আমি বাসায় থেকে (অখাদ্য) রান্না করতাম। এরপর সেজেগুজে তার ফেরার অপেক্ষায় থাকতাম। ইস্ট লন্ডনে যখন আমি কাজ নিই, তখন নর্থইস্ট থেকে হোয়াইটচ্যাপেল—পুরো রাস্তা সে গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিতে আসত। কেন জানেন? আমার যেন রাতে একাকী ট্রেনে করে বাড়ি ফিরতে না হয়, সেজন্য। কিংবা, হয়তো সে আমার সাথে থাকতে চাইত।

কম বয়সি দম্পতি হিসেবে, আমরা নিজেদের জন্য কিছু নিয়মও ঠিক করে নিয়েছিলাম। ইসলামিক বয়ান শোনার জন্য প্রতি সোমবার ওয়াটফোর্টে এক বন্ধুর বাড়িতে যেতাম। সাপ্তাহিক ছুটিতে যেতাম তার মাকে দেখতে। আর শনিবারে অনেক রাত অব্দি জেগে দুজন গল্প করতাম, হাসাহাসি করতাম। জানেন, খুব হাসতাম আমরা।

প্রথম সন্তান আসার পর একটু নড়েচড়ে বসলাম। কেননা এখন আমরা বাবা-মা হয়ে গিয়েছি!

প্রথমবার সন্তান জন্ম দেওয়ার মুহূর্তটা আমি কখনোই ভুলব না। বাড়িতেই ছিলাম আমি। সুলাইমান ছিল আমার পাশে—শান্ত এবং ভরসাদাতার মতন। আমার বোন উপরের তলায় রান্না করছিল। আমি বাথরুমে স্বাভাবিকভাবেই সন্তান প্রসব করলাম। এরপর সবাই মিলে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেলাম। সে রাতে, বাবুটা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাচ্ছিল না। আমি ছিলাম খুবই ক্লান্ত, আর পাগলপ্রায়। সুলাইমান কার্পেটে বাবুকে শুইয়ে দিল। এরপর সে নিজের শরীরটা বাঁকা করে বাবুকে ঘিরে রাখল। যতক্ষণ না·বাবু ঘুমাচ্ছে, ততক্ষণ অব্দি সে ওভাবেই ছিল। আর এই স্পর্শটা সে কোনোদিনও হারায়নি।

এরপর সময়ের পালাবদলে আমাদের আরো চারটি সন্তান দুনিয়াতে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ। তিনজনের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে। আর একজন হাসপাতালে। আমরা দুজন কাজও পালটেছি অনেক। প্রথম প্রথম সুলাইমান ছোটোখাটো কোম্পানিগুলোর জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করত। তারপর একটা মোবাইল কোম্পানি শুরু করল। অবশেষে মিশরের একটা কল সেন্টারে থিতু হলো। আমি প্রথমে শিক্ষকতা করেছি। এরপর নিজের ঘরের সামনে একটা স্কুল খুলেছিলাম। তারপর লেখালিখি আর মেহেদি পরানোর কাজ করি। অবশেষে পুরোদমে লেখালিখিটাকে আঁকড়ে ধরলাম। পাশাপাশি 'সিস্টার্স' নামক একখানা সাময়িকী প্রকাশ করতাম।

তৃতীয় সন্তান জন্মের পর সিদ্ধান্ত নিলাম—আমরা ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যাব। মিশরে গিয়ে ঘর করব, যেন সন্তানরা সহজেই কুরআন শিখতে পারে, আরবি বুঝতে পারে। মিশরে অবশ্য আমাদের খুব ভালো সময় কেটেছিল। আশেপাশে কিছু বন্ধুবান্ধবও জুটে গিয়েছিল, যারা ঠিক একই কারণে মিশরে পাড়ি জমিয়েছে। এরপর আমরা হজ করলাম, আর সিদ্ধান্ত নিলাম বাচ্চাদের জন্য হোম স্কুলিং শুরু করব।

খুব সহজেই আমরা একে অপরকে বুঝতে পারতাম, সাহায্য করতে পারতাম। স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি আমরা ছিলাম একে অন্যের পরম বন্ধু, আত্মার আত্মীয়।

এটা বলতে বাধা নেই যে, সে না থাকলে, আমি আজকের আমিতে কখনোই পরিণত হতাম না।

সুলাইমানের বোঝাপড়া আর ধৈর্য আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে—দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই। সে কখনোই আমাকে কোনো কিছুর জন্য আদেশ করত না, জোর খাটাত না। সে শুধু আমাকে পরামর্শ দিত, আমাকে সুযোগ দিত—যেন আমি নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারি, নিজেকে শুধরাতে পারি। তার লক্ষ্য ছিল, সবসময় আমাকে সহায়তা করা, আমার সম্ভাবনাগুলো পূরণ করা। কেননা, এটাই সেই গুণ যা আমাদের একত্র করেছে। এটা অবশ্য তার কথা, আমার না!

তো ২০১৬ সালে কী এমন হয়েছিল যে পাঁচ সন্তানের জননী, আচানক একটা পুরোদস্তুর ব্যবসায়ের মালকিন বনে গেল! অথচ ব্যবসায় সম্পর্কে তার ন্যূনতম জ্ঞানও নেই৷ কীভাবে একটা অজানা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সে মোকাবিলা করবে?

বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পার করে, শো-আপ তথা আত্মপ্রকাশ বলতে আমি আদতে কী জেনেছি, শিখেছি—সেই গল্পটা এই বইতে লিখব। কিছু পন্থাও বাতলে দেব—কীভাবে আমি নিজেকে ঐ পরিস্থিতিতে সামলেছি, শূন্য থেকে সবটা শুরু করেছি৷ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এবং বিভিন্ন ওস্তাদের শিক্ষার ফলে আমি যা যা ভাবনার খোরাক পেয়েছি, অনুপ্রেরণা পেয়েছি সেসবও বলার তাগিদ থাকবে।

আমি চাইব, বইটা যখন আপনি পড়বেন, তখন মাঝে মাঝে একটু বিরতি নিবেন। বসে ভাববেন, নিজেকে প্রশ্ন করবেন। প্রতিটা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করবেন, আর একটু একটু করে নিজের পরিকল্পনা বানাবেন—কীভাবে আপনি নিজেকে নিজের জীবনের নায়করূপে তৈরি করবেন।

বইটা দাগাতে, প্রয়োজনীয় নোট নিতে কার্পণ্য করবেন না। পাতার খালি জায়গা-গুলোতে নিজের পরিবর্তনের গল্পটা লিখতেও ভুলবেন না যেন।

আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটা ফ্রি ওয়ার্কবুক[১] তৈরি করেছি৷ সেটা ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন। আমি দুআ করি, এটা যেন আপনাকে জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ও গভীর ধারণা পেতে সাহায্য করে, শো-আপ তথা আত্মপ্রকাশের পথচলা শুরু করতে অনুপ্রেরণা জোগায়৷

* * *

১ এখান থেকে ওয়ার্কবুকটি ডাউনলোড করতে পারবেন— www.naimarobert.com/showup

শো আপ:
মুসলিম নারীদের প্রেরণার বার্তা

অধ্যায়-১

সব হারিয়ে আমি

দাম্পত্য জীবনের চৌদ্দ বছর প্রায় শেষ। স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলাম—বাচ্চাদের নিয়ে উমরাহ করতে যাব। ভেবেছিলাম এটাও হয়তো একসাথে কাটানো আরেকটা সুন্দর মুহূর্ত হবে। সবাই মিলে খুব মজা করব, আবার ইবাদতও হবে। কিন্তু তা হয়নি। এখনও আমার মনে হয়, সেটা ছিল মূলত আমার জীবনে পতনের সূচনা।

সুলাইমান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বড় ছেলেটা আর তার বাবার মধ্যে খানিকটা মনোমালিন্যও শুরু হয়েছে ততদিনে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা রীতিমতো ভেঙে গিয়েছিল, ঠিক করার কোনো সম্ভাবনাই দেখছিলাম না। আমি দেখলাম, এই ব্যাপারটা সুলাইমানের ওপর বেশ ভারী হয়ে পড়ছিল। কাজের চাপও ছিল খুব। এতটা অসুস্থ, বিচলিত আমি তাকে আগে কখনো দেখিনি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা, এক বান্ধবীর সাথে বাহিরে খেতে গেলাম। সুলাইমান আর বাচ্চারা বাড়িতেই ছিল। আমার ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে ছোটো মেয়েটাকে ঘুম পাড়াতে লাগলাম, ওর বয়স তখন দুই। সাথে নিজেই কখন ঘুমিয়ে গেলাম, টেরও পাইনি। পরদিন সকালবেলা। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙল। ওরা কেঁদে কেঁদে বলছিল—বাবা ঘুম থেকে উঠছে না।

আমি দৌড়ে শোবার ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি সুলাইমান একপাশে কাঁত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো অর্ধেক খোলা। ঠোঁট বেয়ে অদ্ভুত একধরনের তরল গড়িয়ে পড়ছে।

ঠিক কী পরিমাণ ভয় পেয়েছিলাম সেদিন, সেটা বলে বোঝাতে পারব না। শুধু বলব, সেদিন রাতে জানতে পেরেছিলাম সুলাইমান স্ট্রোক করেছে। মস্তিষ্ক এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এখন সে কোমায় আছে। ডাক্তাররা খুব একটা আশা দিলেন না। তাদের মতে, সুলাইমান আর নেই। শরীরটাই শুধু আছে।

সেই দিনটার কথা মনে পড়লে আমার এখনও কান্না পায়। শাশুড়িকে কল দিয়ে বলতে হবে—আপনার ছোটো ছেলে কোমায় আছে। জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত ছিল সেটা, বড়ই হৃদয়বিদারক।

পরের দুই সপ্তাহ আমরা রাতদিন সুলাইমানের সেবা করেছি। কিন্তু, তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। তারপরও আমি প্রতিদিন তার পাশে বসতাম, কথা বলতাম, তিলাওয়াত করতাম, দুআ করতাম। পরিদর্শনের সময়টাতে যেন মানুষের ঢল নামত। অনলাইন-অফলাইন, দুই জায়গা থেকেই মানুষের এত ভালোবাসা, এত যত্ন, এত সমর্থন পেয়েছিলাম, যা বর্ণনা করা মুশকিল। যারা সেই খারাপ সময়টাতে আমাদের জন্য দুআ করেছেন, হাসপাতালে আমাদের দেখতে এসেছেন, আমাদের জন্য রান্না করে পাঠিয়েছেন, প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের পাশে ছিলেন—তাদের সবার জন্য আমি প্রতিদিন দুআ করি।

এক বোন তো আমার সন্তানদের তার বাড়িতে নিয়ে রেখেছিল, যেন তাদের পড়ালেখার ক্ষতি না হয়। আরেক বোন, যাকে আমি ঠিকমতো জানতামও না, সে তার ফ্ল্যাটে আমাকে সপ্তাহখানেক থাকতে দিয়েছিল। কেননা তার বাসাটা হাসপাতালের কাছেই ছিল। ভাই-বোন, পরিবারের সদস্যরা, সহকর্মীরা, কর্মচারীরা বিদেশ থেকে কায়রোতে চলে এসেছিল আমাদের সাহায্য করতে। এ সবকিছুর জন্য আমি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকব।

সেসময় আমি লিখেছিলাম:

শব্দেরা পানির মতো:
কখনো কখনো
অবিরাম বয়ে চলে,
পাথরের গা বেয়ে অবিরত।
কখনো কখনো
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে,
বহু বাধা পেরিয়ে,
বিন্দু বিন্দু করে
যদবধি ফিরে না পায় নতুন স্রোত!
অতঃপর
শব্দেরা রূপ নেয় জলপ্রপাতে
ছুটে চলে প্রবল বেগে
একরাশ মুগ্ধতা জমিয়ে
ধরণির বুকে মিশে
শব্দের তালে তালে
অশ্রুধারায় ভেসে।

অতি প্রবল সেই স্রোতধারা
ঠিক যেন ঝরনাধারা
আমার অধীরতা ভাসিয়ে নিতে
জমানো নীলব্যথা ভুলিয়ে দিতে
পবিত্র করতে
নির্মল করতে
আমায় পুনরায় পরিশুদ্ধ করতে।
মনোহারী শব্দেরা ভেসে আসে
যদবধি মিনিটের কাঁটা ঘণ্টায় পৌঁছে
এবং আমার হাত আবদ্ধ তোমার হাতে।
বাকারা আছে সুরক্ষা দানে,
কাহাফ আজ শুক্রবার দিনে
দুটো সপ্তাহ গেল ফুরিয়ে,
মনে পড়ে তোমায় অনুক্ষণে।

* * *

দুই সপ্তাহ পর, আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। গিয়েই ছেলের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কেননা, নিজের ঘরে গেলেই আমার সুলাইমানের কথা মনে পড়ত।

সেদিন ফজরের আগে একটা কল আসলো। অনেক চেষ্টা করেও আমি নাম্বারটা চিনতে পারলাম না। কলটা রিসিভ করতেই পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ডাক্তার কল করেছেন। জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তটার জন্য আমি নিজেকে আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম।

অবশেষে সেই খারাপ মুহূর্তটা আসলো। আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীর হৃদপিণ্ড কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা প্রায় মিনিট ত্রিশ যাবৎ সিপিআর দিয়ে চেষ্টা করেছে৷ কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। কণ্ঠটা খাদে নামিয়ে কোনো মতে জবাব দিলাম—জাযাকাল্লাহু খাইরান।

এরপর এক লাফে বিছানা থেকে নেমে সিজদাহতে লুটিয়ে পড়লাম। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর!

এই মুহূর্তটা নিয়ে আমি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম। পাশাপাশি এটার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুতও করছিলাম। সেই দিন থেকে, যেদিন ঐ বোনটার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। একবার হাসপাতালে এক বোন এসেছিল

আমাদের দেখতে। সেদিন সে আমাকে একটা গল্প বলল। গল্পটা এক দম্পতিকে ঘিরে, যাদের সন্তানটা প্রচণ্ড অসুস্থ ছিল। যতবার তারা হাসপাতালে আসত, ততবারই ডাক্তারকে নতুন নতুন কারণ বলতে হতো—কেন তাদের সন্তানটা এখনও সুস্থ হচ্ছে না। আর প্রত্যেকবারই স্বামীটা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলত—'ভুলে যেও না।' বেশ কিছুদিন ধরে এমনটা চলল। ডাক্তার খারাপ কিছুর সম্ভাবনা করত, স্বামীটা স্ত্রীকে ভুলে না যাওয়ার কথা বলত। অতঃপর একদিন সেই সংবাদটা আসলো। যেটা শুনে যেকোনো বাবা-মায়ের হৃদয় খানখান হয়ে যাওয়ার কথা—তাদের সন্তান আর বেঁচে নেই।

এ খবর শুনে লোকটা তার স্ত্রীর দিলে তাকিয়ে বলল—এখনি... এরপর দুজনই সিজদাহয় গিয়ে রবের শুকরিয়া আদায় করল।

এটা দেখে, হাসপাতালের কর্মীরা বেশ অবাক হলো। কেউ কেউ তো ভয়ও পেয়েছিল রীতিমতো। এমন একটা সংবাদ শুনে মানুষজন চিৎকার করে, কাঁদে, শোক পালন করে। অথচ তারা সিজদাহ দিয়ে সেটা উৎযাপন করছে?

হাসপাতালের কর্মীরা সেই দম্পতিকে জিগ্যেস করল—এমনটা কেন করলেন?

এরপর দুজনে সবটা খুলে বলল। তাদের সন্তানের জীবনের জন্য তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে। মেয়েটা তাদের জীবনে সুখ বয়ে এনেছিল, তাদের সাথে ভালোবাসা ভাগ করেছিল। এত বছর ধরে তাকে ভালোবাসার, আদর করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য—আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত না?

ঘটনাটা শোনার পর, আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম, এমন কিছু শুনলে আমি কী করব। আর সেটাই এখন আমি করেছি।

যে ব্যক্তির সাথে আপনি পনের বছর সংসার করেছেন, যিনি আপনার পাঁচ সন্তানের বাবা, যিনি আপনাকে সুরক্ষা দিয়েছেন, আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, যিনি আপনার সবচেয়ে ভালো বন্ধু—আচানক তিনি আর এই দুনিয়াতে নেই! এটা যে কত বড় ক্ষতি, সেটা আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। পুরো দুনিয়ার ভিত যেন নড়বড়ে হয়ে গেল, সবটা কেমন চোখের পলকেই পালটে গেল। দুনিয়াতে আপনার অবস্থান, পরিচয়, দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ সবটা যেন প্রশ্নবিদ্ধ। আবার শোক পালনের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে ইদ্দতও পালন করতে হবে—যেটা পরীক্ষার মধ্যে আরেকটা পরীক্ষা।

- কেন তিনি আমাকে এই পরীক্ষায় ফেললেন?

- আমি এখন কী করব?

খেয়াল করে দেখুন, মাঝে মাঝে পরীক্ষাগুলো আসে অকস্মাৎ, ঝোড়ো বাতাসের মতো। প্রথমে আপনি ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে যান। এরপর সেটা মেনে নেন, কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন। নতুন বাস্তবতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে থাকেন।

কিন্তু প্রথম ধাক্কাটার পর, আরো কিছু ধাক্কা আসা এখনও বাকি। এরপরের পরীক্ষা-গুলো নদীর ঢেউয়ের মতো ক্রমান্বয়ে আসতেই থাকে। প্রথমদিকের পরীক্ষাগুলো হয় ছোটো ছোটো, সহনীয় পর্যায়ের। যা ধীরে ধীরে পরিণত হয় অনিশ্চয়তা ও ভয়ের পাহাড়ে। পরীক্ষার হাত প্রসারিত হতে থাকে। অতঃপর একসময় থাবা বসিয়ে দেয় আপনার দিনরাতে। কয়েক সপ্তাহ ধরে কিংবা মাস নাগাদ চলতেই থাকে এসব। আপনি জানেন না এগুলো কখন শেষ হবে, কবে তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাবেন। তখন আপনি অনুধাবন করেন—প্রথম ধাক্কাটার জন্য আপনি তৈরি থাকলেও, পরেরগুলোর জন্য মোটেও প্রস্তুত নন। এমনটাই হয়, যখন আপনি জীবনসঙ্গীকে চিরতরে হারিয়ে ফেলেন।

ইদ্দতের সময়টাও পীড়াদায়ক। বলে রাখা ভালো, ইদ্দত হলো—কোনো বিধবার, তার স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের একটি নির্দিষ্ট সময়।

একদিকে, আপনাকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে হবে, তাদের ভরণপোষণের ফিকির করতে হবে। এসব দায়িত্ব, চিন্তা ও চাহিদাগুলো বাস্তবসম্মত। এগুলো অবশ্যই আপনার চার মাস দশ দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। এই জায়গাটাতেই আপনি বাধ্য হন—পরিকল্পনা করতে, সামনে এগোতে, দুনিয়ার মুখোমুখি হতে। স্কুল চালানো, ঘুমের আগে বাচ্চাদের গল্প বলা কিংবা সময়ের আগে কাজ শেষ করার মতো ব্যাপারগুলো, মনের ব্যথা ভুলতে খুব কাজে দেয়।

অন্যদিকে, ইদ্দতের ব্যাপারটা আপনাকে এসব করতে বাধা দেয়। আপনি এখনই দুনিয়ার মুখোমুখি হতে পারবেন না। অবশ্যই আপনাকে থামতে হবে, চিন্তা করতে হবে। আপনি একজন বিধবা, এই সত্যটা মেনে নিতে হবে। কষ্ট, একাকিত্ব, রাগ, ভয়, শূন্যতা সবটা কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। আপনাকে এসবের মোকাবিলা করতে হবে, নাহয় এগুলো আপনাকে ভেঙেচুরে দিবে। বারবার স্বামীর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দিবে—শেষবারের মতো ক্ষমা চাওয়া, একটা শেষ ওয়াদা, একটা শেষ চুমো। আপনাকে মানতে হবে যে সবটা আল্লাহর পরিকল্পনা।

যেহেতু এটা আল্লাহর ইচ্ছে, তার মানে এর মধ্যে আপনার জন্য কল্যাণকর কিছু রয়েছে। সেটা কী? তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার, অন্তরটা পরিশুদ্ধ করার, অভ্যাস পরিবর্তন করার একটা সুযোগ আপনি পাচ্ছেন। ইদ্দত শেষে আপনার নতুন জীবনের সূচনা হবে, যেমনটা গুটি থেকে বের হওয়ার পর একটা প্রজাপতির হয়—নবজন্ম, নতুন বেশ, অপূর্ব সৌন্দর্য।

এটা ঠিক, আমি প্রচুর কেঁদেছি। আমার ওজন কমে গিয়েছিল, গায়েব হয়েছিল রাতের ঘুমও। কিন্তু কোনো একটা কারণে আমার মনে হতো—আমি তো বেঁচে আছি। আমি এখনও দুপায়ে দাঁড়ানো। অবশ্যই এটার কোনো না কোনো কারণ আছে। একটা স্বর্গীয় কারণ। মানুষজন প্রায়ই আমাকে জিগ্যেস করে—তুমি কীভাবে নিজেকে সামলে নিলে? শোক কাটিয়ে উঠলে?

এর ব্যাখ্যায় আমি বলি:

> আমার জীবনে আমাকে একাই চলতে হবে। আল্লাহ আমাকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন। আমার যোগ্যতা, গুণগুলো যেমন স্বতন্ত্র; পরীক্ষা এবং কাজগুলোও ভিন্ন। আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, অবশ্যই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। আমার অনেক কাজ করা বাকি, সমাজে অবদান রাখা বাকি। আর বাকি কিছু কীর্তি রেখে যাওয়া। এই দুনিয়াতে আমার প্রয়োজনীয়তা আছে।

এসব করার জন্য আমার কাছে একটাই উপায় আছে—শো-আপ; নিজের অবস্থান জানান দেওয়া। আত্মপ্রকাশ করতে হবে সহনশীলতার সাথে, প্রকৃতরূপে, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে।

সুতরাং, আমরা যারা বিভিন্ন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছি বা জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি—তারা এটাকে নিজেদের পরীক্ষা হিসেবে নিতে পারি। আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো বিধবা, কেউ তালাকপ্রাপ্তা, কেউ আবার একাকী মা, কর্মহীন কিংবা সন্তানহীন। আমাদের জীবনটাকে আমরা আবার নতুন করে শুরু করেছি, যা আমাদের একটা নতুন পরিচয় বহন করছে—আমরা মজলুম বা নিপীড়িত।

এই বইটা থেকে আপনি অন্য কোনো বার্তা না নিলেও একটা বার্তা অবশ্যই নিতে পারেন—আপনাকে ঠিক করতে হবে, নিজের জীবনের গল্পটা আপনি কীভাবে বলবেন। দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষ তিনটি অবস্থানে থাকতে পারে—হয় তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, নয়তো পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে কিংবা সামনে নেওয়া হবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম এবং আল্লাহর সুন্নাহ।

অতএব, যেহেতু আপনি জেনেছেন সবার পরীক্ষার ধরনই আলাদা, সুতরাং আপনি বেছে নিতে পারেন—আজীবন মজলুম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেবেন না কি নিজেই নিজের গল্পের নায়ক হবেন।

মনে রাখবেন, গল্পের নায়কের জন্য সবটা কখনো সহজ হয় না। তাকে একটার পর একটা সংগ্রাম করে নিজের আত্মোপলব্ধি বাড়াতে হয়, ব্যক্তিত্বকে উন্নত করতে হয় এবং শেষে একটা সুন্দর সমাপ্তি থাকতে হয়। প্রতিটা সংগ্রাম তাকে করে তোলে আরো শক্তিশালী। প্রত্যেকটা পরীক্ষা তার বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। প্রতিটা ক্ষতির পর সে হয় আরো জ্ঞানী, লাভ করে চিন্তার গভীরতা। এ কারণেই জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সে একটা উত্তম মানুষে পরিণত হয়। আগুনে পুড়ে পুড়ে সে হয় খাঁটি সোনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কীভাবে নিজেদের জীবনের নায়ক হব?

আমাদের বুঝতে হবে, দুনিয়ার বুকে জীবন একটাই। এই এক জীবনে, জীবনের উদ্দেশ্য পুরা করতে হবে, সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে, মহৎ কিছু করে যেতে হবে। এজন্য একটাই মওকা, নিজেকে প্রকাশ করা। আর এগুলো হতে পারে;

- আল্লাহর জন্য আত্মপ্রকাশ করা।
- পরিবারের জন্য আত্মপ্রকাশ করা।
- বন্ধুবান্ধবের জন্য আত্মপ্রকাশ করা।
- সমাজের জন্য আত্মপ্রকাশ করা।
- নিজের জন্য আত্মপ্রকাশ করা।

কিন্তু এখনই কেন?

এখনই কেন আমি আপনাদের শো আপ-এর দিকে আহবান করছি, তার তিনটা কারণ আছে৷

এক. আপনাকে স্বতন্ত্র কিছু গুণ ও যোগ্যতা দিয়ে, বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে এই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং, ভয় এবং অজুহাত নামক মুখোশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না।

দুই. আপনি জানেন না কয়দিন বাঁচবেন। তাই সেই 'বিশেষ' দিন আসা অব্দি নিজের জন্য এবং আশেপাশের মানুষগুলোর জন্য আত্মপ্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার কোনো অর্থই হয় না।

তিন. আত্মপ্রকাশের জন্য আপনি কেবল একটাই সুযোগ পাবেন। এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির একটা জীবন উপভোগ করতে পারে না স্রেফ আত্মপ্রকাশ না করার কারণে। আর সেই অভাগীদের মতো আপনি হবেন না।

* * *

অধ্যায়-২

আত্মপ্রকাশ মানে কী?

মাঝে মাঝে, কোনো বিষয়কে তার ঠিক উলটোটা দিয়ে সহজেই বোঝানো যায়। এখানে আত্মপ্রকাশের বিপরীত হলো—মুখোশ পরে থাকা, হরেক চরিত্রে নিজেকে উপস্থাপন করা। যেমন ধরুন,

- এমন একজন সেজে থাকা, যেটা আদতে আপনি না।
- আপন মানুষগুলোর সামনে নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ না করা।
- বিরক্তি সহকারে জীবনের দায়-দায়িত্বগুলো পালন করা।
- নিজেকে নিপীড়িত মনে করা।
- একটা আলাদা মুখোশ পরে থাকা।
- মোটের ওপর, নিজের আসল সত্তাকে লুকিয়ে রাখা।

কেন আমরা এভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখি, তার বেশ কিছু কারণ আছে। আমরা অন্যের মন্তব্যকে ভয় পাই, সমালোচনা বা নিন্দা মেনে নিতে পারি না। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা হারতে ভয় পাই।

এই ভয়টাই আমাদের নিজের আসল সত্তাকে বাহিরে আনতে দেয় না। জীবনে আশাবাদী হতে ও হিম্মতের সাথে নিজেকে প্রমাণ করতে পদে পদে বাধা দেয়।

আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। আত্মপ্রকাশ করা মানে শারীরিক ও মানসিক-ভাবে নিজের অবস্থান জানান দেওয়া, কাজের দায়িত্ব নেওয়া, মালিকানা গ্রহণ করা। আপনি যে-ই চরিত্রেই থাকেন না কেন, সমস্ত কমতির ঊর্ধ্বে গিয়ে আপনার আসল সত্তাকে চেনানো। নিজের জীবন এবং উদ্দেশ্যের সাথে ওয়াদাবদ্ধ থাকা। আপনাকে যে কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটা সঠিকভাবে পালন করা। শো-আপ তথা আত্মপ্রকাশ বলতে আমি বুঝি—একটা পদক্ষেপ, একটা মনোভাব।

মোদ্দাকথা, আপন জীবন গল্পের নায়ক হওয়া।

আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা একটা মধ্যমমানের জীবনযাপন করে। তারা জীবনের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে হিমশিম খায়, কিছু অর্জন করতে পারে না, চারপাশে কোনো প্রভাব ফেলতেও হয় ব্যর্থ। এর বড় একটা কারণ হলো—বেশিরভাগ মানুষ কঠিন কাজটার তুলনায় সহজ কাজটা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। দায়িত্ব নেওয়ার বদলে বাহানা বানাতে ওস্তাদ। হিরো হওয়ার বদলে আজীবন মজলুম হয়েই থাকতে ভালোবাসে।

আমরা অধিকাংশই ঘুমের ঘোরে জীবনটা কাটিয়ে দেই। এটা বুঝি যে, জীবনে আমাদের আরো কিছু করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই অনুপ্রেরণা বা জ্ঞান আমাদের মধ্যে থাকে না যে, আমরা আর কী কী করতে পারি। কিংবা আমরা এটা বলে নিজেদের বুঝ দেই—একদিন সবটা পরিবর্তন করে ফেলব, একদিন আমরা বাহিরে পা রাখব, একদিন কাজগুলো ভিন্নভাবে করব। আফসোসের বিষয় হলো, ঐ 'একদিন'-টা স্রেফ আমাদের একটা কল্পনা। এটা এমন এক খোয়াব যা অজানা ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক সময়সীমা। আমরা বলি—একদিন আমরা এটা করব, ওটা করব। অনেকটা এরকম বলা—আমি জানি আমার এটা করার যোগ্যতা আছে। কিন্তু আমি করব না। কারণ, এতে আমার কিছু যায়-আসে না।

সত্যিই আপনার কিছু যায়-আসে না?

কিন্তু এটা তো আপনার জীবন। আর জীবন তো একটাই। এটাকে আপনি সফল করবেন না কি বিফল—পুরোটাই আপনার মর্জি। আপনার নষ্ট করা প্রতিটা ঘণ্টা, অপচয় করা প্রতিটা দিন, উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটানো প্রতিটা সপ্তাহ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটানো প্রতিটা মাস—আপনার জন্য বরাদ্দকৃত সময়েরই অংশ। এই সময়টা আপনি কীভাবে ব্যয় করতে চান? জীবনের শেষ দিনগুলোতে কেমন গল্প অন্যদের শোনাতে চান? নিজের জন্য কী কীর্তিগাথা রেখে যাচ্ছেন?

আপনাদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগানোর জন্য কথাগুলো বলছি না। আমি জানি, অলসতার প্রতি আমাদের কেমন আকর্ষণ, তালবাহানার শক্তি কতখানি। কিন্তু আমি নিজের ও আপনাদের ক্ষেত্রে এসব মেনে নিতে নারাজ। আজ যদি আপনি খানিকটা পরিবর্তন না করেন, তবে সামনের সপ্তাহটা এ সপ্তাহের মতোই হবে। পরবর্তী বছরটাও এ বছরের মতোই কাটবে অনাড়ম্বরভাবে, হেলায়-ফেলায়।

প্রিয় বোন আমার, একটু বুঝুন—

> আজ যদি আপনি নিজেকে প্রকাশ করার কোনো সিদ্ধান্ত না নেন, তবে হয়তো আর কখনোই নিতে পারবেন না। তাই এটার মুখোমুখি হোন।

> কাজটা একদমই সহজ নয়, তাই না? যেখানে অধিকাংশ মানুষ অটো-পাইলট মোডে চলছে, সারাটা জীবন ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে, সেখানে তো আরোই না।

জানেন, এখানে ঘুমিয়ে কাটানো বলতে আমি আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছি? এর মানে, সারাটা জীবন আমরা রোবটের মতো একটা গৎবাঁধা রুটিনেই কাটিয়ে দিচ্ছি। কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই জীবন শেষ করছি। ব্যাপারটা আমাদের জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে—আত্মিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক কিংবা পেশাগত। প্রতিটা ক্ষেত্রেই মানুষ ঘুমিয়ে কাটায়।

এর মূল্য কিন্তু অনেক বেশি। আমি যখন আমাদের অধিকাংশের কথা ভাবি যারা অটো-পাইলটের জীবনযাপন করছে, ধূ ধূ মরুভূমির মতো আমি শুধু অপচয়ই দেখি—সম্ভাবনার অপচয়, সুযোগের অপচয়, জীবনের অপচয়।

আমরা আর কতজন এভাবে বোবা আর বধির হয়ে দিন পার করব? আশেপাশের কাজগুলো কিংবা সম্পর্কগুলোর সাথে পুরোপুরি যুক্ত না হয়ে, জীবনযাপন করব? দুনিয়াকে বলে বেড়াচ্ছি—আমরা ভালো আছি, সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলছে। অথচ ভেতরে ভেতরে আমরা প্রতিনিয়ত শেষ হয়ে যাচ্ছি। কতজন এভাবে নিজের চাহিদাকে কুরবান করে অন্যদের সাহায্য করব? নিজের ইচ্ছের ওপরে অন্যের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেব? অথচ আমরা নিজেদের স্বপ্নগুলো বুকের গহিনে কবর দিয়েছি, যেগুলো কখনো বলা হয়নি, কারো কাছে প্রকাশ করা হয়নি। আমরা কতজন নিজেদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ত্যাগ করেছি শুধু এই কারণে যে, আমরা ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়ানো, নিজেদের টেনে তোলার শক্তিটুকু আর নেই, তাই না?

হ্যাঁ, আমি জানি তাকদির আমাদের নিয়তি ঠিক করে। সুতরাং, আমাদের এই প্রশ্নটা করা উচিত নয়—যদি এমন হতো? কিন্তু আমি আপনাকে জিগ্যেস করতে চাই—

> আপনি জানেন আল্লাহ আপনার তাকদিরে কী লিখে রেখেছেন? আপনি কখনো নিজের ভবিষ্যৎ দেখেছেন? আল্লাহ আপনাকে একটা হতাশায়-ভরা জীবন দিয়েছেন—এটা বলার পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ আছে আপনার কাছে? তিনি আপনার জন্য সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের, তৃপ্তির একটি জীবন রেখেছেন—এটা অবিশ্বাস করার মতো কোনো বিশেষ কারণ আছে আপনার কাছে? বলুন, আছে?

তারপরও আমরা অধিকাংশই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বলি, আল্লাহ আমার তাকদিরে এমনটাই লিখে রেখেছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, প্রায় সময়ই এই কথাটা আমরা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করি। সত্যটা আড়াল করার জন্যই আমরা কোনো কিছুতেই মাথা ঘামাতে চাই না। ঘুম থেকে জেগে এই সত্যটার মুখোমুখি হওয়ার—আমাদের কিছু করার আছে, অনেক কাজ করা বাকি, আমাদের মধ্যে যা আছে, তা দিয়েই ভালো কিছু করতে পারি—এটা আমাদের জন্য কষ্টকর। তারচেয়ে বরং ঘুমিয়ে, নিস্তেজভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই আমাদের কাছে আনন্দের।

কিন্তু কাহিনি কী জানেন, তাকদিরকে নিজের অসন্তুষ্টির অজুহাত হিসেবে দেখানোর চেয়েও বেশি কিছু আপনি করতে পারেন। যদি জীবনে আরো বেশি কিছু পেতে চান তবে আপনাকে আরো বেশি কাজ করতে হবে। জীবনটা অনেকটা এমন—যেমন কর্ম তেমন ফল।

মহা-মহিম আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

> “নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।” (সুরা রাদ: ১১)

আয়াতটা এবার আপনাকে ভাবাচ্ছে, তাই না?

যদি আমরা পরিবর্তন দেখতে চাই, উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে চাই, ব্যাপারগুলোকে আরো ভালো করতে চাই—তাহলে আমাদের চলতে হবে, কাজ করতে হবে। এরপর না আমরা বিশ্বাস আর ভরসার মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা করতে পারি।

যেমনটা হ্যাল এলরড তার চমৎকার বই *দ্য মিরাকল মর্নিং*-এ বলেছেন, “আপনাকে সেই মানুষটাই হতে হবে, যে মানুষটা আপনার হওয়া প্রয়োজন। যদি জীবনে কিছু পেতে চান, তবে সেই কাজগুলোই করুন, যা আপনার করা দরকার।”

সুতরাং, আমরা যদি সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের একটা জীবন পেতে চাই, তবে আমাদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা হতে হবে। অধিকাংশ মানুষ যে কাজগুলো করছে, তার চেয়ে ভিন্ন কিছু, ভিন্নভাবে করতে হবে।

যেমন, যদি আপনি বিশ্বাস বাড়াতে চান, জীবনে আরো বরকত আনতে চান, কিংবা অধিক ভালোবাসা, সুখ, অর্থপূর্ণ মুহূর্ত পেতে চান, অথবা কাজে পূর্ণ

উদ্যমী হতে চান—তবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ করার জায়গায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। আপনার চালচলন, হাবভাবেও বিস্তর বদল আনা জরুরি।

মাঝে মাঝে আপনার খানিকটা অস্বস্তিবোধ হতে পারে। এমন মনে হতে পারে, আপনি স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাচ্ছেন। প্রায় সময়ই হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু মনে রাখবেন,

> "আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত একটা যাত্রার সূচনা। নিজেকে স্বীকার করা এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণের একটা সুন্দর যাত্রা। একটু অস্বস্তি লাগা স্বাভাবিক, তাই না? কিন্তু এখনই তো সময়। এখন না হলে আবার কখন? আপনি না হলে আর কে?"

আজই সিদ্ধান্ত নিন—এই মধ্যমমানের জীবন থেকে আপনি বেরিয়ে আসবেন। এখনই কাজে নেমে পড়ুন। আর পেছনে পড়ে থাকা নয়, আর হেরে যাওয়া নয়, বরং আত্মপ্রকাশের সময় এখন।

আত্মপ্রকাশ: নবিজির একটি সুন্নাহ

আত্মপ্রকাশকে যদি আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করি—নিজের দায়িত্বটা বুঝে নেওয়া, আপন কাজের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া, অনেক কমতি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মেনে নেওয়া—তবে দেখব ইসলামের ইতিহাসে এর ভুঁড়ি ভুঁড়ি নজির আছে। গোটা সীরাত গ্রন্থেই এমন হাজারখানেক উদাহরণ আছে, যেখানে আমরা দেখি সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারী, পুরুষ, শিশুরা কীভাবে নিজেদের প্রকাশ করেছেন। যদিও অনেকের জীবনেই এমন কিছু স্বর্ণালি মুহূর্ত আছে, কিন্তু আমি শুধু শেষ নবি ও রাসুল সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি।

নবিজির জীবনীর যে দিকটা আমার সবচেয়ে পছন্দের তা হলো, এটা খুব অনুপ্রেরণাদায়ক। তাঁর গোটা জীবনজুড়ে এত এত পরীক্ষা আল্লাহ নিয়েছেন যে, খুব সহজেই তাঁকে মজলুম হিসেবে দেখানো যেত। আর এর যৌক্তিক কারণও ছিল যথেষ্ট।

তাঁর জীবনের কিছু মর্মান্তিক ঘটনা দেখুন—এতিম হলেন; বয়সে বড় একজন নারীকে বিয়ে করলেন—যিনি একবার তালাকপ্রাপ্তা, অন্যবার বিধবা; নিজ বিশ্বাসের কারণে অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছেন; শহর থেকে বের করে নির্বাসনে দেওয়া হলো; আপন মানুষদের মৃত্যু দেখলেন—বাদ যায়নি নিজের সন্তানেরাও,

এমনকি বংশের নাম রাখার মতো কোনো পুত্রও জীবিত ছিল না; ছিলেন দরিদ্র; ছিল গোটা উম্মতের ভার যার কাঁধে।

অথচ দেখুন, নবিজির জীবনটা আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে কতটা অনুপ্রেরণাদায়ক—নিজের মনকে অনুসরণ করা; সঠিক কাজটা করা, যদিও তার ফল ভোগ করতে হয়; ভয় এবং সন্দেহকে দূর করে মন খুলে অন্যকে ভালোবাসা এবং দয়া দেখানো; বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ী হওয়া।

শত প্রতিকূলতার পরও নবিজি সা. আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেবল নিজের জীবনের নয় বরং গোটা মুসলিম উম্মতের নায়ক হয়েছেন। আজ আমি যা আছি, তা কখনোই হতে পারতাম না; আজ আমি যা বিশ্বাস করি, তা কখনোই করতাম না; আজ আমি যা জানি, তা কখনোই জানতাম না—যদি তিনি এই যাত্রাটা শুরু না করতেন, নিজের অবস্থান জানান না দিতেন, যা করার দরকার ছিল তা না করতেন।

আমি আরো একজন নারীর গল্প আপনাদের বলতে চাই। যার নবি-পরিবারের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে ছিল না কোনো ক্ষমতাবান নারী। কিন্তু তার গল্পটা খুবই সাহসিকতাপূর্ণ এবং সততারও। তার আত্মপ্রকাশের ঘটনাটা এখনও রক্ষিত আছে, যা হয়ে গেছে ইসলামের অনুশাসনের একটা অংশ।

গল্পটা একটা মেয়ের, যে দুধের ব্যবসায় তার মাকে সাহায্য করছিল। লোভে পড়ে মা তাকে বলল, দুধে একটু জল মেশাতে। যেন পরিমাণে বেশি হয়, লাভও বেশি পাওয়া যায়। মেয়েটা সাথে সাথে তা নাকচ করে দিল। সাথে খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের নিষেধাজ্ঞার কথাও মনে করিয়ে দিল।

মা কন্যাকে তিরস্কার করে বলল, "খলিফা এখন কোথায়? তিনি তো আমাদের দেখছেন না।" কন্যার সোজাসাপটা জবাব, "খলিফা না দেখুক। আল্লাহ তো দেখছেন!"

জানেন, এই গল্পটা আমি এখানে কেন বললাম?

> যদি আমরা পরবর্তী প্রজন্মের ভালোর জন্য নিজেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই, কিংবা চুপচাপ ঘরের এক কোণে পড়ে রই—এটা প্রভাব ফেলে। একটা পরিবর্তন আনে, আর সবটা হিসাব করা হয়।

* * *

অধ্যায়-৩

জীবনপটে আত্মপ্রকাশের স্বরূপ

প্রতিদিন আপনাকে বেশ কিছু চরিত্রে কাজ করতে হয়—

- ইবাদতগুজার
- নারী
- স্ত্রী
- মা
- কন্যা
- বন্ধু
- মালিক
- নেত্রী

যেকোনো একটি চরিত্রে যদি আপনি সত্যিকারভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চান—তবে ব্যাপারটা কেমন হবে? নিজের জন্য এবং আপন মানুষগুলোর জন্য পরিবর্তনটা কেমন হওয়া উচিত তখন?

- যদি ইবাদতে নম্রতা দেখান;
- যদি নারীত্বতে আনন্দ বয়ে আনেন;
- যদি স্ত্রী হিসেবে আন্তরিক হোন;
- যদি মাতৃত্বে উদ্দেশ্য যোগ করেন;
- যদি নিজের কাজটাকে গুরুত্ব দেন;
- যদি সম্পর্কগুলোতে মনোযোগী হোন;

তবে আপনাকে আর অটো-পাইলট মোডে চলতে হবে না। তখন আপনি যে কোনো চরিত্রেই নিজেকে মোক্ষমভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

আপন আপন শক্তির বলে, নিজের সত্যিকার পরিচয়টা দাবি না করে, বরং নিজেকে লুকানোর মতো সহজ পন্থাটা আমরা সবাই বেছে নিতে পারি।

আমি জানি, দীর্ঘদিন ধরে একটা বিশেষ পরিচয়ের আড়ালে নিজের সত্যিকার পরিচয়টা আমি চেপে রেখেছিলাম। কেননা, আমি চাইতাম সবাই আমাকে পছন্দ করুক, ভালোবাসুক। আমি সবসময় নিজেকে একটা অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে দেখতে চাইতাম। সেজন্যই সবার আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে নিজেকে তৈরি করতাম।

কিন্তু, যদি আপনি নিজের সত্যিকার পরিচয়টা গোপন করে অন্যের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে নিজেকে তৈরি করেন—তাহলে দিনশেষে শুধু হতাশা আর ব্যর্থতাই নজরে আসবে।

অনেকদিন পর্যন্ত মনে হয়েছে—দুটো পরিচয় আমার।

এক. বাহিরের আমি,

দুই. ভেতরের আমি।

তাছাড়া পরিচয় দুটোও ছিল বিপরীতমুখী। আমি কার সাথে আছি এবং সে আমাকে কেমন দেখতে চায়, সেই অনুযায়ী নিজের পরিচয়টা আমি বদলে ফেলতাম। এর মানে হলো, সবার সামনে আমি নিজেকে একরকমভাবে প্রকাশ করছি, আর ভেতরে অন্য আমি।

জনসম্মুখে আমি এমন একজন নারী, যার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। যে অন্য নারীদের অনুপ্রেরণা জোগায়। কিন্তু পরিবারের কাছে, আমি এর কোনোটাই ছিলাম না। এটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে আমি নিজেকে একটা গল্প শুনিয়েছি। গল্পটা এমন—আমি কোনো ভালো মা না। আসলে মা হওয়ার ব্যাপারটাই আমার সাথে যায় না। সন্তানদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তারা কখনোই আমার সবচেয়ে বড় কীর্তি নয়।

আমি জানি, এটা একটু আশ্চর্যজনক শোনাচ্ছে। যেখানে খোদ ইসলামেই মায়েদের অনেক বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে; পরিবার গঠনে এবং পরবর্তী প্রজন্ম তৈরিতে তার ভূমিকাকে সম্মানিত করা হয়েছে।

কিন্তু আমি এমনটাই ভাবতাম।

এই গল্পটা, আমার ব্যর্থতা ও দুর্বলতাকে আড়াল করতে সাহায্য করত। আমার মনে হতো, পরিবার নিয়ে আমার আসলে কোনো লক্ষ্যই নেই। মোটামুটি আমাকে একটা গণ্ডির মধ্যেও বেঁধে ফেলেছিল এই ব্যাপারটা। নিজের দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করতে, অতীতের ভয়কে ভুলে ভবিষ্যৎ থেকে উপকৃত হতে বাধা দিত।

এরপর, আমি এই ভাবনাটাকে চ্যালেঞ্জ করলাম। আমার সন্তানরা আমার মধ্য থেকে ভালোটা পাওয়ার হকদার। তারা দুনিয়ার বুকে আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপহার—এসব ভেবে নিজের বিশ্বাসকে মজবুত করলাম। তারপর নিমিষেই সবটা কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল।

একটা সময়ে সন্তানদের তারবিয়াত ও দেখভালের জন্য আমি তাদের সম্পূর্ণ জিম্মাদারি নিলাম। কাজ এবং ব্যবসায়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে না রেখে, নতুন এক নেতৃত্বের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অথচ এটা প্রচণ্ড ভয়ানক ও আমার জন্য সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত ছিল। তবে আমি এবং আমার সন্তানরা ইতোমধ্যে উপকার পাওয়া শুরু করেছিলাম। তাদের জন্য আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি শতভাগ বিশুদ্ধতার সাথে। আর এও আমি জানি, ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালো কিছু করতে পারব ইন শা আল্লাহ।

তাহলে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটা আপনার ক্ষেত্রে কেমন?

আপনি বুঝতেই পারছেন, নিজেদের আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটা চরিত্র, ব্যক্তি এবং অবস্থানভেদে ভিন্নভিন্ন হবে। তবে আত্মপ্রকাশের সংজ্ঞার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না—

আত্মপ্রকাশ মানে—উপস্থিত হওয়া; সত্যিকারভাবে, নম্রতার সাথে।

চলুন তবে দেখা যাক, কীভাবে আপনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন—সৎভাবে, আন্তরিকতার সহিত।

৩.১: নিজের জন্য নিজেকে প্রকাশ

নিজের জন্য আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস অবশ্যই দরকার—নিজেকে মেনে নেওয়া এবং নিজেকে ভালোবাসা। বিপরীতে, আজীবন ঘুমিয়ে কাটানো, নিজেকে এবং নিজের চাহিদাগুলোকে অস্বীকার করা, আল্লাহ প্রদত্ত সম্ভাবনাগুলোকে অপচয় করা বড্ড বেশি সহজ।

সুতরাং, যখনই নিজের জন্য নিজেকে প্রকাশ করার কথা ভাববেন, তখনই নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজবেন—

- আমি আত্মিকভাবে নিজের জন্য আত্মপ্রকাশ করছি? আমি কি আল্লাহর আরো কাছাকাছি যেতে চাই—যেন বেশি বেশি ইলম অর্জন করে অন্যকে তা শেখাতে পারি?

আমি নিজের চরিত্রকে উন্নত করতে চাই? ইবাদতের মান বাড়াতে আগ্রহী? আমি নফসকে হারিয়ে নিজের আদর্শ মোতাবেক জীবনযাপন করতে চাই? না কি আমি স্রোতে ভাসছি? ইমানকে নিজের প্রাপ্য হিসেবে ধরে নিয়েছি আর ক্রমাগত বাহানা বানাচ্ছি?

■ আমি আবেগ-অনুভূতির জায়গা থেকে আত্মপ্রকাশ করছি? নিজের আবেগকে বুঝে উঠতে পারছি? তাদের মোকাবিলা করছি? আমি অতীতের জখমকে সারিয়ে তুলছি? ভেতরের অনুভূতিগুলো অন্যের সাথে ভাগ করছি? নিজের দায় স্বীকার করছি, মনোবল বৃদ্ধিতে কাজ করছি? না কি আবেগ-অনুভূতিগুলোকে পাত্তা না দিয়ে দমিয়ে রাখছি?

■ আমি শারীরিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করছি? আল্লাহ আমাকে যে শরীর দিয়েছেন, তার যত্ন নিচ্ছি? নিজের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখছি? পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছি, নিয়মিত ব্যায়াম করছি? না কি নিজেই নিজের ক্ষতি করছি? নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বদ অভ্যাস ছাড়ছি না?

■ আমি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আত্মপ্রকাশ করছি? নিজের দুনিয়া সম্পর্কে জানছি? উপলব্ধি এবং জ্ঞানার্জনের দক্ষতা বাড়াচ্ছি? আত্মোন্নয়নের বই পড়ছি, লেকচার বা ওয়ার্কশপে অংশ নিচ্ছি? নিজের মস্তিষ্কের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি কতটা ওয়াকিবহাল? না কি অলসভাবে বসে আছি? নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকছি?

৩.২: স্বামীর জন্য নিজেকে প্রকাশ

একজন স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করার মানে কী?

আবার বলছি, এর মানে হলো—উপস্থিত থাকা, মনোযোগী হওয়া। নিজের বৈবাহিক বন্ধনের ক্ষেত্রে বিনয়ী হওয়া, সততা বজায় রাখা। আমাদের অনেকের জন্য হয়তো কাজটা কঠিন। কেননা, আমাদের সবসময় বলা হয়েছে—ভালো স্ত্রী হওয়ার একটাই উপায়, যদি না আমরা আগে কষ্ট পেয়ে থাকি। ভালো স্ত্রী হওয়ার অভিনয় করা, সব দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করা, ভালো ভালো কথা বলা, কষ্ট পাওয়া হতে নিজেকে দূরে রাখা—আরো সহজ।

এভাবেই, আমরা অন্যের বিচার আর সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি সত্যিকার অর্থেই সম্পর্কটাতে সুখী? আমরা কি নিজের মতো আছি? এসব করার হিম্মত আমাদের আছে?

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

> "তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণের মতন।"
> (সুরা বাকারাহ: ১৮৭)

এই আয়াতটা সামনে আসলে আমাদের মনে পড়ে—পোশাক হলো সেই বস্তু যা আমাদের সুরক্ষা দেয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মনে ভালোবাসা জন্মায়। স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করার মানে—সবগুলো কাজ আন্তরিকতা ও সততার সাথে করা, একরাশ সন্তুষ্টি আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে করা।

যখনই আমরা বউ হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করব, যাদের পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে—আমরা নিজেকে মানিয়ে নিতে, পরিবর্তন করতে চেষ্টা করব। স্বামীর সাথে তাল মেলাতে আমাদেরও তার সাথে বড় হতে হবে, কিংবা প্রয়োজনে ছোটো হয়ে যেতে হবে।

পোশাকের কথাই ধরুন। গরমকালে আমাদের হালকা পোশাক পরতে হয়। শীতকালে আবার ভারী পোশাক পরি। কখনো আমাদের সরল এবং ঘরকুনো হয় থাকতে হয়। কখনো বা নিজ নিজ পরিস্থিতি এবং মনের অবস্থার ওপর নির্ভর করে হতে হয় অতিরঞ্জিত।

এভাবেই আমরা স্বামীর সাথে মানিয়ে নিতে পারব। যখন তার মাথায় কোনো খারাপ চিন্তা আসবে, আমরা তখন ভালো কথা বলব। যখন সে ডান মস্তিষ্কে আটকে থাকবে, তখন আমরা তার বাম মস্তিষ্ক হয়ে কাজ করব। যখন সে অসুস্থ হবে, তখন আমরা তার ঢাল হয়ে দাঁড়াব। যখন তার ঘুমানো প্রয়োজন, তখন আমরা তার বালিশ হয়ে যাব। তার কাছে নিজেকে নমনীয় ও আশ্বাসের জায়গা হিসেবে প্রমাণ করতে হবে৷ কখনো নিজে দুর্বল হয়ে তার থেকে শক্তি নিতে হবে, কখনো তার থেকে উপযোগিতা নিতে হবে, কখনো বা নিজে যেচে পড়ে গিয়ে তার সাহায্য চাইতে হবে।

মোটকথা, আপনার বৈবাহিক জীবনে আত্মপ্রকাশ করা মানে—সম্পর্কটাতে সৎ থাকা। নিজের আসল সত্তাকে বের করা। উভয়ের জীবন গঠনে কর্মঠ ও মনোযোগী হওয়া।

৩.৩: সন্তানদের জন্য নিজেকে প্রকাশ

মাতৃত্বকে, দায়িত্ব এবং কাজের অনন্তকাল ধরে চলমান একটা রুটিন হিসেবে দেখা হয়। সময়, মনোযোগ আর শক্তির চাহিদার কারণে, দিনশেষে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাই। সারাদিন ধরে ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো চলতে বাধ্য হই। মনে দানা বাঁধে হতাশা এবং বিরক্তি। আমরা একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলি ঠিকই, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমরা অচল। জীবনে আর কোনো আনন্দ, উচ্ছ্বাস, প্রত্যাশার জায়গা থাকে না। আমাদের সন্তানরাও সেটা বোঝে। তারা খেয়াল করে—মা সুখে নেই, সেজন্য তিনি সন্তানদের সময় না দিয়ে মোবাইলে ব্যস্ত। সেজন্যই তো তিনি ঘুমানোর সময় অমনোযোগী থাকেন, কথা বলার সময় সন্তানদের চোখের দিকে তাকান না।

আমি আপনাকে এখন লজ্জিত হতে বলছি না, আমি যেটা বলছি—মা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ না করে আপনি বরং ভুল করছেন। দুনিয়া এবং আখিরাত দুটোই হারাচ্ছেন। সন্তানদের জন্য নিজেকে প্রকাশ করার পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রাখতে হবে, ব্যাপারটাতে পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে কর্মঠ হওয়া জরুরি। মা হিসেবে আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে—বংশ বৃদ্ধি করতে হবে, নিজেদের আচরণ উন্নত করতে হবে, দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে, আমাদের আচরণে ও প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে।

মা হওয়া মানে—নিজের কাজগুলোকে কর্তব্য হিসেবে না নিয়ে বরং নিজেদের করণীয় হিসেবে দেখতে হবে।

৩.৪: পরিবারের জন্য নিজেকে প্রকাশ

একই জিনিস পরিবারের বেলাতেও খাটে—সম্পর্কগুলোর উদ্দেশ্য কী? নিজের কাজের দায়ভার নিচ্ছি তো? দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সেসব দূর করছি? পরিবারের ঠিকঠাক খেয়াল রাখছি, যেভাবে তারা আমার খেয়াল রাখছে? না কি আমরা রোবটের মতো আচরণ করছি? দায়সারাভাবে কাজ করে আসল 'আমি'কে লুকাচ্ছি? সময় এসেছে এসব নিয়ে একফালি ভেবে দেখার।

৩.৫: স্বপ্নগুলোর জন্য নিজেকে প্রকাশ

আপনাদের মধ্যে এমন ক'জন আছেন, যারা স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছেন? পরিকল্পিত ভাবনাগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন? লক্ষ্যগুলো হাত ফসকে বেরিয়ে যেতে দিয়েছেন?

আমি এমন অনেক বোনের খবর জানি, যাদের হৃদমাজারে ছিল বিবিধ স্বপ্নের আবাস। তন্মধ্যে কেউ কুরআন হিফজ করতে চেয়েছেন তো কেউ সন্তানের হোমস্কুলিং-এর স্বপ্ন দেখেছেন। পক্ষান্তরে কেউ একটা ব্যবসায় শুরু করতে চেয়েছেন, তো কেউ আবার হতে চেয়েছেন প্রচণ্ড ভ্রমণপিয়াসি। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন কিংবা একটা বই লিখা অথবা দাতব্য সংস্থা স্থাপন—এই ফর্দের যেন অন্ত নেই।

কিন্তু, নিজের স্বপ্নগুলোকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা আদতে এতটা সহজ নয়। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং চারপাশের মানুষগুলো বারবার আপনাকে এটা স্মরণ করিয়ে দিবে যে, আপনার স্বপ্নগুলো নিতান্তই অবাস্তব, নিরেট আকাশকুসুম ভাবনা। আর সেই স্বপ্নগুলো সাধন করা যে একেবারেই অসম্ভব, এটাই আপনাকে তারা পইপই করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইবে। তাই নিজের স্বপ্নগুলোর জন্য বাঁচতে হলে, সর্বপ্রথম তাদের যথার্থতা আপনাকে মেনে নিতে হবে।

নিজের স্বপ্নগুলোর জন্য আপনি বাঁচবেন কেননা আপনার সেই স্বপ্নগুলো মহা মূল্যবান। আশারাজি পূরণ করতে ব্যয়িত আপনার মূল্যবান সময় কিংবা শ্রম, কোনোটাই বৃথা যাচ্ছে না। আরো একটুখানি ভালো কিছু করা কিংবা অধিক অর্জনের সক্ষমতা অথবা আরো বেশি উন্নতি করার এই যে অদম্য ইচ্ছে—এই ব্যাপারগুলোকে সম্মান করুন। মোদ্দাকথা, খোদ নিজেকে সম্মান দিতে শিখুন।

তাই সময় এসেছে নিজের স্বপ্নগুলোর জন্য বাঁচার নিমিত্তে এখনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। আর সে-মতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, যেন সেই চিরসবুজ স্বপ্নগুলো অনায়েসে বাস্তবায়িত হয়।

ভাবনার খোরাক: আপনি অন্তরে কোন স্বপ্নের লালন করছেন? ভবিষ্যতে তা নিয়ে কী ভাবছেন? কোন পরিকল্পনাটা সত্যি হওয়ার জন্য মনে মনে সেটার আশা করছেন?

৩.৬: প্রভাবক বৃত্ত

আপনি হয়তো ভাবছেন—নিজের আসল রূপটা দেখালে হবেটা কী? কিংবা আপনি ভাবছেন—আমি স্রেফ একজন মা, আমি বিখ্যাত কেউ নই। সেজন্যই শুরুতে আমি নিজের গল্পটা আপনাদের বলেছি, চিন্তা করার খোরাক জুগিয়েছি। এখন ভেবেচিন্তে এই প্রশ্নটার উত্তর দিন তো—আপনার প্রভাবক বৃত্তের মধ্যে কারা আছে?

জনপ্রিয় আমেরিকান বক্তা, স্যার জোহরা সারওয়ারি এবং আমি একবার ইংল্যান্ড সফরের সময় আলাপ করেছিলাম। আমরা সাতাশটির মতো অনুষ্ঠানে একসাথে কথা বলেছি, যা ইস্ট লন্ডনের একটা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রুমের পরিবেশ ছিল

উষ্ণ এবং ইতিবাচক। আমরা বিভিন্ন অনুপ্রেরণাদায়ক কথাবার্তা শুনছিলাম—মুসলিম নারী হিসেবে আমরা কতটা ভাগ্যবতী, নিজেদের পরিচয়টা আমরা কীভাবে প্রকাশ করব, সমাজে কীভাবে নিজেদের পদচিহ্ন রাখব, এসব। উদাহরণ হিসেবে অতীত এবং বর্তমানের অনেক মহীয়সী নারীর গল্প বলা হলো। অতঃপর, আমাদের আর কোনো সন্দেহই রইল না যে—আমরা পারি। বরং আমাদের উচিত মুসলিমা হিসেবে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা।

আলোচনা শেষে, সকলকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলো। একজন বোন হাত উঠিয়ে প্রশ্ন করলেন—যদি আপনি জনপ্রিয় কেউ না হতেন? তার কণ্ঠে কিছুটা সংকোচ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—যদি ফেসবুকে আপনার এত এত ফলোয়ার না থাকত? যদি আপনি একজন সাধারণ নারী হতেন? তার প্রশ্নে অনেকে সহমত জ্ঞাপন করল। রুমের পরিবেশ ক্রমশ ভারী হতে লাগল।

প্রশ্নটা তো ঠিকই আছে। ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে ত্রিশ হাজার ফলোয়ার না থাকলে আমরা কীভাবে পরিবর্তন আনব? জাতীয় পত্রিকায় লিখতে না পারলে আমরা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করব? আমরা যদি সুপরিচিত হতে না পারি, তবে কীভাবে পরিবর্তন আসবে?

এবার আমি আপনাদের আসল ব্যাপারটা বলি:

আমরা সবাই প্রভাব বিস্তারকারী। সবাই মানে প্রত্যেকে।

কারণ, আমাদের সবার আশেপাশেই একটা প্রভাবক বৃত্ত আছে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ আমাদের ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, আমাদের থেকে পরামর্শ চায়।

ভেবে দেখুন। সেটা হতে পারে আপনার সন্তানেরা বা আপনার পরিবার। আপনার হালাকা সংস্থা কিংবা কলেজের নারী সংগঠন। আপনার সহকর্মী কিংবা কর্মচারীও হতে পারে। কিংবা আপনি যে স্কুলে পড়াচ্ছেন তার বাচ্চারা বা বোর্ডের সদস্যরা। হতে পারে এলাকার মসজিদ কিংবা সামাজিক সংঘ, ফেসবুক আইডি বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এমনকি হতে পারে আপনার ব্লগ, ওয়েবসাইট, টুইটার বা ত্রিশ হাজার ফলোয়ার সংবলিত সেই ইনস্টাগ্রাম আইডিও।

এবার আপনি দেখলেন তো বৃত্তটা কীভাবে ধীরে ধীরে বাড়ছে?

আমাদের সবার মধ্যেই কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, সমস্যা আছে, যা দুনিয়ায় আমাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। যেমন, ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজের সর্বস্ব দিয়ে

আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর ইবাদত, নিজের ও অন্যের জীবনে বরকত নিয়ে আসে। যার কোনো হিসাব নেই, যা সংখ্যায় গণনা করা যায় না। আছে স্রেফ গুণগত মান।

> আপনার প্রভাবক বৃত্ততে থাকা মানুষগুলোর জীবনে যদি আপনি কোনো প্রভাব রাখতে চান—তবে আল্লাহকে ভরসা করুন, তার ওপর বাকিটা ছেড়ে দিন। আপনি শুধু নিজেকে প্রকাশ করুন, একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রাখার চেষ্টা করুন। এমন কিছু, যা আপনি চলে যাওয়ার পরও মানুষ দীর্ঘদিন মনে রাখবে বিইজনিল্লাহ।

* * *

অধ্যায়-৪

কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন?

এখন আপনি জেনে গেলেন যে, প্রাত্যহিক জীবনে আপনি একজন প্রভাব বিস্তারকারী। এবার তবে সমস্যাটা নিয়ে কথা বলা যাক। মাঝে মাঝে আপনার হয়তো নিজেকে দেখাতে ইচ্ছে করবে না। কেননা, সত্যি বলতে এরচেয়ে সহজ কাজ হলো অটো-পাইলট হয়ে কাজ করা।

প্রতিদিন একই সময়ে বিরক্তিকর এলার্মের শব্দে আপনি ঘুম থেকে জাগেন। এরপর নামাজ পড়েন, সাধ্যমতো তিলাওয়াত করার চেষ্টা করেন। কিংবা সেই একঘেয়ে রুটিন কাজ—বাচ্চাদের ঘুম থেকে জাগানো, ইউনিফর্ম খুঁজে বের করা, দুপুরের খাবার রান্না করা, স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তায় জ্যামে বসে থাকা, সন্তানদের বিদায় জানানো, এরপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। এরপর বাসায় ফিরে আসেন, নয়তো অফিসে চলে যান। অফিসের কাজ শেষ করেন। বাসায় এসে বাচ্চাদের কাজ ও সংসারের অন্যান্য কাজ—রাতের খাবার রান্না, হোমওয়ার্ক দেখা, গোসল, ঘুমানো।

প্রতিদিন, একই কাজ।

পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি, সরকার—সবার থেকে কী পরিমান মানসিক চাপ প্রতিদিন আপনি পান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই চাপ আপনাকে একটি নির্দিষ্টভাবে কাজ করতে, ভাবতে, দেখতে, আচরণ করতে বাধ্য করে।

যা কি না বিরক্তিকর!

মাঝে মাঝে দায়িত্ব, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা একটা আক্রমণের মতো লাগে। কখনো আবার, অসার হয়ে পড়ে থাকাকে একমাত্র উপায় বলে মনে হয়। বোবা হয়ে থাকার মাধ্যমে কষ্টগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, যে দিন আমার উপলব্ধি হলো যে, আমি জড়বস্তুর মতো দিন কাটাচ্ছি। বাহিরে থেকে দেখলে মনে হতো, সবটা আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে, আমার দুনিয়াটা ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। এটা তখনকার কথা,

যখন আমি আবার বিয়ে করেছি এবং সন্তানদের নিয়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছি। আমি নিজের খেয়াল রাখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আমার ওজনও বেড়ে গিয়েছিল খানিকটা। চুলে ঠিকমতো চিরুনি দিতাম না। এমনকি শেষ কবে একটা সুন্দর পোশাক পরেছি, তাও মনে পড়ত না। আয়নায় তাকিয়ে দেখতাম—ধূসর রুক্ষ চুল, চোখের নিচের কালি, চেহারার বলিরেখা।

মাঝে মাঝে ভেতরে ভেতরে চিৎকার করতাম—'না, এটা তুমি নও। তুমি এর চেয়েও ভালো। সবটা আবার নিজের কবজায় নাও। কিছু একটা করো।'

কিন্তু, তার জন্য খুব বেশি খাটুনি করা লাগত। আমি অসার হয়ে আরামে পড়ে থাকাকেই পছন্দ করতাম।

মেয়েদের ঘুম পাড়ানোর সময় গল্প বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। একটা সময়, এটা ছিল আমাদের বন্ধনকে মজবুত করার অন্যতম একটি উপায়। এটা ছিল একটা পথ, যা তাদেরকে জাগ্রত অবস্থা থেকে ঘুমের রাজ্যে পৌঁছে দিত। শৈশবের মধুর এক স্মৃতি। কিন্তু আমি এত বেশি ব্যস্ত হয়ে গেলাম যে, দিনশেষে একদম ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকতাম। এতটাই ক্লান্ত যে, বই পড়ার জন্য পাঁচটা মিনিট বের করাও আমার কাছে অনেক কষ্টকর ছিল।

ভিতরটা ডুকরে কেঁদে উঠত—'না, সময়গুলো নষ্ট করো না। তুমি টের পাওয়ার আগেই সেগুলো শেষ হয়ে যাবে। এগুলোকে মূল্যায়ন করো, এখনও তোমার হাতে সময় আছে। অবসর বের করো।'

কিন্তু খাটুনিটা খুব বেশি ছিল। আমি নির্জীব থেকে নিজেকে বোঝাতাম—এটাই আমার নতুন জীবন।

নিজের স্বপ্ন ও চিন্তাভাবনাগুলো নতুন স্বামীর সাথে ভাগাভাগি করাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাকে আমার দূরের কেউ মনে হতো। সুস্থ দাম্পত্য জীবন নিয়ে বেশ কিছু বই আমি পড়েছি, আর সেসব নিজের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য মরিয়া ছিলাম। আমিই ছিলাম, যে সবসময় বাহিরে খাবার খাওয়ার পরিকল্পনা করতাম, সুন্দর সুন্দর চিরকুট লিখতাম, ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করতাম। কিন্তু, আমার মনে হতো বিষণ্নতা যেন আমাকে জেঁকে বসেছে। প্রতিটা 'ভালোবাসি' আমার কাছে মিথ্যা মনে হতো।

ভেতরে কিছু একটা অনুনয়-বিনয় করত—'না, মানুষটাকে তোমার প্রাপ্য ধরে নিও না। তুমি জানো না, কতটা সময় তোমার হাতে আছে। ভালোবাসা কেবলই একটা শব্দ। সেভাবেই ভালোবাসো, যেভাবে তুমি চাও।'

দস্তুর মতো আমি খাটাখাটনি করতাম। অসার হয়ে পড়ে থাকতে চাইলাম। ধরে নিলাম—আমার কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

এই পর্যায়ে, যখন আমি বোবা হয়ে থাকলাম, তখন হতাশারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তবে একটা জিনিস আমি জানতাম, আমি এর চেয়েও ভালো করতে পারি।

এটাকে স্বীকার করা বললেও, বাস্তবে আমি ঐ সহজ রাস্তাটাকেই বেছে নিলাম—আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই নিষ্ক্রিয়তা আর হাল ছেড়ে দেওয়া হলো, আত্মপ্রকাশের পুরো উলটো এক কিসিম।

যখন আমরা অসার হয়ে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিই, ঘুমের ঘোরে চলতে থাকি, তখন আমরা ভাবি নিজেদের রক্ষা করছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা হারিয়ে ফেলছি—একটা সুন্দর, অর্থবহ, উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন। ক্রমশ আমরা একটা লক্ষ্যপূর্ণ জীবনকে হারিয়ে ফেলছি।

> "আমরা বেছে বেছে একটা একটা করে নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে অসার করে দিতে পারি না। যখন আমরা একটা দুঃখের অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে দেব, সাথে সাথে কিছু সুখকর অনুভূতিও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।"—ব্রেন ব্রাউন

স্বাধীন

এই যাত্রায় আমি স্বাধীন,
অভীষ্ট লক্ষ্য আমার অধীন।
এই প্রহরে আমি মুক্ত,
এই পরীক্ষায় আমি উন্মুক্ত।
আমি স্বীকার করি,
অবাধে বয়ে চলি!
আত্মসমর্পণ করে
নিজেকে গড়ে তুলি।
অতঃপর দ্রুতবেগে,
এগিয়ে যাই গন্তব্যে।
আমার হৃদয় জানে,
তিনি আছেন আমার পাশে

যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে।
এবং তিনি আগলে রাখবেন,
জীবনের অন্তিম মুহূর্তে।
তিনি সর্বদাই ছিলেন সাথে,
এবং তিনি চিরকালই থাকবেন।

সুতরাং, নিজেকে সত্যিকার অর্থে প্রকাশের জন্য কোন পদক্ষেপগুলো নেব আমরা?

আমি আমার আৎমপ্রকাশের যাত্রাটাকে ছয় ভাগে ভাগ করেছি। যদি আপনি এটা অনুসরণ করেন, তবে নিজেকে আরো কর্মঠ, শক্তিশালী হিসেবে তৈরি করতে পারবেন বিইজনিল্লাহ।

আপনি তৈরি তো? তাহলে শুরু করা যাক।

* * *

ধাপ-১:

মনজিল ঠিক করুন

নিয়তের গুরুত্ব কতখানি, তা কোনো মুসলিমের অজানা নয়। সঠিক নিয়তই পারে পার্থিব কোনো একটা কাজকে পরকালের পাথেয় বানাতে। আবার এই নিয়তের কমতি বা অনুপস্থিতিতে আখিরাতের কোনো কাজও হয়ে যেতে পারে দুনিয়াবি, বরকতশূন্য।

নবিজি সা. আমাদের শিখিয়েছেন, কাজের ফলাফল তার কর্মে নয় বরং উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যের অনুপাতে ফল লাভ করব।

এ ব্যাপারে উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর বর্ণনাটা উল্লেখ করা যায়। তিনি নবিজিকে বলতে শুনেছেন, "সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য। আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করা অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

নবিজি আমাদের আরো শিখিয়েছেন যে, আমাদের ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সঠিক উদ্দেশ্য। সে কারণেই, কোনো একটা কাজ আমরা কেন করছি—এই ব্যাপারটাতে এত বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু, একটি নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ঠিক করা বলতে আদতে কী বোঝায়? এর মানে, কাজের মূল্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা, সেই কাজটার আসল মানে জানা। ব্যাপারটা আপনাদের জন্য সহজ করছি। আপনার সারা দিনকার কাজগুলো যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে চান, তবে এই প্রশ্নগুলো নিজেকে করুন—

- এই কাজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কী?
- উক্ত কাজ এবং সেটা সম্পাদনের ক্ষমতা—আপনার জন্য কী মানে রাখে?
- আপনার আশেপাশের মানুষদের সাথে এই কাজের সম্পর্ক কী? এটা অন্যদের আপনার সম্পর্কে কী বার্তা দেয়?

আমার মতে, এর একটা সুন্দর উদাহরণ হলো রান্না করা। হেঁশেলের কাজটা অমনোযোগী হয়ে, উদ্দেশ্যহীনভাবে করা খুব সহজ। এটা কোনোমতে শেষ করতে পারলেই হলো, তাই না? বিরক্তিকর, উটকো ঝামেলা কিংবা সময় অপচয় হিসেবে গণ্য করাও অসম্ভব নয়। আমি জানি, কারণ আমারও আগে এমনটা মনে হতো। যতবার আমি নিজেকে রোবটের মতো চলতে দেখতাম, ততবারই প্রশ্ন করতাম—

- কাজটার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কী?
- এটি আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
- অন্যদের সাথে এর সম্পর্ক কী? আমার সম্পর্কে এটা তাদের কী বার্তা দিচ্ছে?

কিন্তু এরপর, রান্নার কাজের পেছনে একটা বড় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করলাম—পরিবারের জন্য রান্না করা কত মহৎ একটা কাজ, আমি কত সৌভাগ্যবান। প্রতিদিন রান্না করার ব্যাপারটা ভালোবেসে করলে কেমন হয়। দিনশেষে পরিবারের লোকজন জানবে, বুঝবে, তারা আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি নিজের জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করেছি। কাজগুলোকে আগে আমি যেভাবে দেখতাম, সে দৃষ্টিভঙ্গি পালটে সফলও হয়েছি। নিজের পরিবার তথা নিজের জীবনকেও অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছি। হঠাৎ করেই, পরিবারের সেবা করা আমার কাছে আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছে। সবটা আমি মেনে নিয়েছি। খেয়াল করে দেখলাম, কীভাবে আমার সেবার দ্বারা আমার পরিবার পরম যত্ন ও ভালোবাসা উপভোগ করে।

ভাবনার খোরাক: এই উদ্দেশ্যের ব্যাপারটা আপনার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে? একটু ভেবে দেখুন, যে জায়গাগুলোতে আপনি সাধারণভাবে কাজ করেন বা সেবা দেন; সেখানে মণিমুক্তো খুঁজে বের করুন, সেই কাজগুলো যা থেকে দ্বিগুণ ফায়দা পাওয়া যাবে—এপার এবং ওপারে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা মানের অভাবে আমরা ভোগান্তির স্বীকার হই তা কিন্তু নয়। বরং আমরা সেসব উদ্দেশ্য বা মানে খুঁজে পেতে অক্ষম। আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদের তুলনা করি। আমরা নিজেদের বিচার করি, কারণ আমরা অমুক বোনের মতো কর্মঠ নই বা তমুক বোনের মতো এত কিছু জানি না। আমরা নিজেদের ওপর এত জুলুম করি যে শেষমেশ হতাশ হয়ে নিজের যোগ্যতায় প্রশ্ন তুলি।

কিন্তু ব্যাপারটা হলো,

নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করার কোনো মানে নেই, কেননা আমরা অন্য বোনদের মতো নই। আমাদের শুধু নিজের উদ্দেশ্যে মনোযোগী হওয়া উচিত—নিজের জীবনে আমরা কী করছি। যা-ই করি, আল্লাহর প্রতি যেন আনুগত্য থাকে এবং নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে যেন কাজটা করি। বাকিটা আল্লাহর হাতে।

যে অবস্থায় আছেন সেটাকেই উপভোগ করুন:

আমার স্বামী যখন মারা গেল, মনে আছে, আমি নিজেকে কী ভাবতাম। আমি জানতাম যে, অল্প কিছু বোনদের মধ্যে আমি একজন, অল্প কিছু বিধবাদের আমি একজন। এখানে আমি কী শিখলাম? আমি হতবাক ছিলাম। সমাজে একটা প্রভাব রাখতে গিয়ে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি—এর মধ্যেও কোনো কল্যাণ রয়েছে?

আমি উপসংহার টানলাম—হ্যাঁ, আছে। হয়তো এটা আমার জন্য কোনো পরীক্ষা। হয়তো আমার শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। হয়তো যারা আমাদের দেখছিল, তাদের জন্য এটা একটা বার্তা ছিল। কিংবা হয়তো বা অন্য কিছু।

আমি জানতাম, আল্লাহ্ আমাকে এই কষ্ট সহ্য করার জন্য বেছে নিয়েছেন। ঐ সময়টাতে নিজেকে প্রকাশ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন—একটা নতুন চরিত্রে কাজ করতে, সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে।

এই পরীক্ষাটা আমি বাধা হিসেবে নেইনি, বরং প্রত্যাবর্তনের একটা সুযোগ ভেবেছি।

একবার ভাবুন, আমাদের সবার জীবনেই নিজ নিজ অবস্থান ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কি সংগ্রাম নেই?

কোনো বোনকে বৃদ্ধ বাবা-মার দেখাশোনা করতে হচ্ছে, তো আরেকজনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একজন শিশু আছে। নয়তো অন্যজনকে স্কুলের বাচ্চাদের দেখভাল করতে হয়। কারো হয়তো বড় কোনো চাকরি আছে, আরেকজন নতুন ব্যবসায় শুরু করেছে। কেউ বা বছরখানেক ধরে ব্যবসায় করছে, কিংবা নিজের স্বল্প বেতনে বাচ্চাদের ভরণপোষণ দিচ্ছে। কেউ হয়তো দুনিয়াজুড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, অন্যজন পত্রিকায় লিখছে, আরেকজন কবিতা লিখছে বা ছবি আঁকছে। অন্যজন হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলো মেলে ধরছে।

সবাইকেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে, একেকভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে হচ্ছে। আল্লাহ তাদের যা নেয়ামত দিয়েছেন, সে মোতাবেক এবং তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে। সৌন্দর্য হলো—সুযোগটাকে চেনা, আশীর্বাদ হিসেবে মেনে নেওয়া।

সুতরাং খানিক্ষণ আপনার জীবনটা নিয়ে ভাবুন। দুনিয়ার মানুষদের সাথে, আল্লাহ আপনার সম্পর্কগুলো কেন তৈরি করেছেন? আপনাকে কোন কোন নেয়ামত তিনি দিয়েছেন, যেগুলোর সাহায্যে আপনার জায়গা থেকে আপনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। আপনি ভালো যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো চিনুন, উদ্দেশ্যটা বুঝুন আর সেটা নবায়ন করুন। যেন দুনিয়ার কাজটাকে আপনার আখিরাতের কাজে রূপান্তর করতে পারেন। তারপর পুরোপুরি নিজেকে প্রকাশের জন্য লক্ষ্য স্থির করুন—আরো বেশি মনোযোগী হয়ে, আরো সুগঠিতভাবে।

আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি:

একবার এক বোনের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বলল, অন্যরা তার প্রশংসা করলে এটা তার ভালো লাগে না। যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকার কারণে একটা অনুশীলনের জন্য যখন আমি তার নাম প্রস্তাব করলাম, সে আপত্তি করল। তার মতে, "আমার মনে হয় না আমি এসবের যোগ্য। সব তারিফ তো রবের জন্যই।"

এই অনুভূতির সাথে আপনি নিশ্চয়ই পরিচিত? ইসলামে বিনয় অনেক বড় একটা গুণ। নবিজির ব্যক্তিত্বের একটা দিক এটা। কুরআন এবং হাদিসেও এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিনীত হওয়া মানে, যদি শাব্দিক অর্থ ধরি তবে, কারো গুরুত্বকে কম করে হিসেব করা। অন্যভাবে বললে—নম্রতা, সম্মান, আনুগত্য এবং স্বপ্রভাবিত হওয়া।

অন্যদিকে গর্ব করা একটা নেতিবাচক গুণ। যার স্বরূপ হলো—অহংকার, উদ্ধতস্বভাব এবং শয়তান নিজে। মহা-মহিম আল্লাহ কুরআনের বেশ বড় একটা আয়াতে বলেছেন,

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ইবলিস ছাড়া, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। (সুরা সোয়াদ: ৭৪)

সুতরাং, একদিকে আমাদের বিনয় আছে, যা নিজের ভাবনাকে হটিয়ে দেয়। অন্যদিকে, আমাদের গর্বও আছে, যা নিজেকে বড় কিছু ভাবতে বাধ্য করে, পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

তাহলে আত্মবিশ্বাস কোন দিকে পড়ে?

আত্মবিশ্বাস হলো মূলত একটা অনুভূতি বা বিশ্বাস, যা নিজেকে বিশ্বাস করতে শেখায়। নিজের ওপর বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতে শেখায়। আত্মবিশ্বাসকে আমরা এভাবেও বলতে পারি—নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা, নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, গুণ ইত্যাদির ওপর ভরসা করা। আত্মবিশ্বাসকে অন্যভাবেও বোঝানো যায়—ইতিবাচক, শান্ত এবং প্রস্তুত।

অনেক বোন আমাকে এমনও বলেছে যে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে, কারণ তারা অহংকারী হতে চায় না। যা-ই হোক, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার অক্ষমতা আপনার জীবনে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো—একজন মুসলিমের জীবনে আত্মবিশ্বাস বলে কিছু থাকতে পারে? একজন আত্মবিশ্বাসী মুসলিম নারী—শব্দগুলো কি স্ববিরোধী?

সেই বোনের গল্পে ফিরে যাই, শুরুতে যার কথা বলছিলাম। অন্যের প্রশংসাকে ভিন্নভাবে দেখার একটা স্বরূপ আমি তাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। অন্যের প্রশংসাকে অবজ্ঞা হিসেবে না নিয়ে, "আমি এতটাও ভালো না" না বলে, এটাকে কেন আল্লাহর করুণা হিসেবে নিচ্ছি না? কেন আমরা বিনিময়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও প্রশংসা করার সুযোগ লুফে নিচ্ছি না? সত্যটা অস্বীকার করে কেন সুযোগ হাতছাড়া করছি? আল্লাহ আপনাকে কিছু গুণ এবং দক্ষতা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আপনি অন্যকে সাহায্য করতে পারছেন, অন্যের প্রশংসা পাচ্ছেন।

আপনার আশেপাশের মানুষজন আপনাকে এত ধন্যবাদ দিচ্ছে, কতটা ভাগ্যবান আপনি। তারা আপনার দক্ষতা, মেধা, গুণাবলিকে সম্মান করছে, এসব অপচয় করবেন না। তারা কী বলে শুনুন, সেটাতে ডুব দিন। তা যেন আপনাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রেরণা দেয়। কেননা সত্যটা হলো, মহীয়ান আল্লাহ আমাদের অনেক বেশি নেয়ামত দান করেছেন। এটা আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারব না। সুস্পষ্ট সত্য হলো,

> আল্লাহ আমাদের স্বতন্ত্র কিছু নেয়ামত, মেধা, যোগ্যতা দিয়েছেন। এটা চিরন্তন সত্য।

সুতরাং,

- সেসব নেয়ামতকে অস্বীকার করে আপনি কাকে খুশি করলেন?
- সেই মেধাকে অবজ্ঞা করে কাকে খুশি করলেন?
- সেসব দক্ষতাকে অপমান করে কাকে খুশি করলেন?
- আপনি প্রশংসা শুনতে না পারলে কার কী? কেবল আলহামদুলিল্লাহ্ বলুন, আর নিজের কাজে মন দিন।

আখেরে,

- আল্লাহ আপনাকে হাজার হাজার বার অনুগ্রহ করেছেন। নিদেনপক্ষে এর জন্যও কি কৃতজ্ঞ হওয়া যায় না?
- আল্লাহ্ আপনাকে ওয়াদা করেছেন, এটাও কি আপনাকে প্রস্বস্তি দেয় না?
- দুনিয়ার সমস্ত কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনি আপনার রক্ষক। এই ব্যাপারটা আপনার মনে আত্মবিশ্বাস জন্মায় না?

আত্মবিশ্বাসী হওয়া এবং নিজেকে অস্বীকার করা বা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করার মধ্যে যদি কোনো দ্বন্দ্ব থাকে, তবে এটা এভাবে সমাধা করা যাবে না।

নেয়ামতগুলো স্বীকার করুন, নিজের যোগ্যতাকে উপভোগ করুন, মেধার জন্য কৃতজ্ঞ হোন। কেননা, এটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনাময় দুনিয়ার দ্বার উন্মোচন করবে। এমন এক দুনিয়া, যেখানে আপনি নিজের শক্তিকে বর্ধিত করতে পারবেন, দক্ষতা বাড়াতে কাজ করতে পারবেন, আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারবেন। এর ফলে, আপনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারবেন—নিজের ভালোবাসার মানুষগুলোর জন্য, শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য। আর আপনার প্রভাববিস্তারকারী বৃত্ততে।

আমি যোগ্য নই:

গেল পাঠেই আমরা দেখেছি, কমবেশি আমাদের সবারই প্রভাববিস্তারের একটা চক্র আছে। তারপরও আমরা নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করি। কেননা, আমাদের সবার কাছে একটা বিশেষ গল্প আছে। যার মূল বক্তব্য হলো—আমরা অযোগ্য, আমরা যথেষ্ট ভালো না, আমরা কখনোই পারব না।

আমি আপনাদের বলছি—আপনি যোগ্য, যথেষ্ট ভালো এবং এজন্য আপনার শুধু নিজেকে চিনতে হবে।

মহীয়ান রব বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ্ কখনোই বান্দাকে সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (সুরা বাকারাহ: ২৮৬)

আল্লাহ্ আপনাকে যে কাজটার জন্য পাঠিয়েছেন, আপনি সেটার যোগ্য—একজন নেতা হিসেবে, একজন সমর্থক হিসেবে, একজন রক্ষণশীল কিংবা একজন উৎসাহদাতা হিসেবে। আল্লাহ্ আপনাকে খুব ভালোভাবে জানেন, আপনার শক্তি এবং দুর্বলতাও তাঁর অজানা নয়। তিনি আপনাকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য। আপনি জানেন সেগুলো কী। ভরসা রাখুন যে আল্লাহ্ যা করছেন, তা তিনি জানেন। এই সময়ে এই জায়গায় আপনি আছেন, অবশ্যই একটি বিশেষ কারণে। আপনার কাছের মানুষদের এমন কিছুর প্রয়োজন, যা কেবল আপনিই দিতে পারেন। এসব স্বীকার করুন, মেনে নিন, ভাবনায় ডুব দিন। নিজেকে সম্মান ও উদ্দেশ্যে ভরপুর করুন। আল্লাহ্ আপনাকে এগুলো দান করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেকে প্রকাশ করবেন, ততক্ষণ অব্দি তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। সবটা কিন্তু আপনাকে একা একা করতে হচ্ছে না। আপনি কাজ করবেন, ফল তিনি দেবেন। কত সহজ আর স্বস্তিদায়ক!

আপনি তাঁর নেয়ামতের জন্য উপযুক্ত। এই আশীর্বাদগুলো স্বীকার করুন, আপন করে নিন। তিনি আপনাকে আরো বাড়িয়ে দেবেন।

* * *

ধাপ-২:

ইতিবাচক হোন

"যেভাবেই চিন্তা করুন—কাজটি আপনি করতে পারবেন, কিংবা পারবেন না; উভয় ক্ষেত্রেই আপনি সঠিক।"—হেনরি ফোর্ড

আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ব্যাপক। আপনি কতটা মেধাবী, কতটা শিক্ষিত, কতটা দক্ষ—এসবে আসলে কিছু যায় আসে না। যদি আপনি ধরেই নেন যে আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তবে হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষুদ্র।

চিন্তা করুন। যদি আপনি ইতোমধ্যে ভেবে নেন যে, কোনো একটা কাজে আপনি সফল হতে পারবেন না। তাহলে আপনি সত্যিকার অর্থে সেই কাজের পেছনে প্রয়োজনীয় সময়, শ্রম, মেধা ব্যয় করবেন? অবশ্যই না। কেননা, আপনি মেনেই নিয়েছেন যে আপনি সফল হবেন না। যত সময় আর শ্রমই ব্যয় করেন না কেন, কোনো লাভ নেই। কারণ আপনি শেষটা নির্ধারণ করে ফেলেছেন। এটা হলো, নফসকে খুশি করার ভবিষ্যদ্বাণী।

সে জন্যই, একটা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা ভীষণ জরুরি, যদি আপনি নিজেকে দেখাতে চান। এটা আপনার জন্য জ্বালানিস্বরূপ।

'আমি পারব' এমন দৃষ্টিভঙ্গি খুবই শক্তিশালী। জীবনে, প্রতিটা কাজের শুরুতে এটা আপনাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। যখন পা পিছলে পড়বেন, এটা আপনাকে শক্তি দেবে। যদি আপনি ধরেই নেন যে আপনি সফল হবেন, তার মানে আপনি সফলতা পেয়ে গেছেন। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আপনি নিজেকে টেনে সামনে নিয়ে যেতে পারবেন।

তাহলে, আমরা কীভাবে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারি?

প্রথমেই মনে রাখবেন, ইসলাম ইতিবাচকতাকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা। তাঁকে ভরসা করা যে, তিনি যা করছেন সবটা আপনার ভালোর জন্যই।

এ সম্পর্কে নবিজি সা. বলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি তেমন, যেমনটা বান্দা আমাকে মনে করে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি সে কোনো মাহফিলে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তার চেয়ে উত্তম মাহফিলে (নিষ্পাপ ফেরেশতাদের মাহফিলে) তাকে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত (দুই বিঘত) অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে একগজ (দুই হাত) অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'" (বুখারি, মুসলিম)

"আমি তেমনই, যেমনটা বান্দা আমাকে মনে করে।" মিনিটখানেকের জন্য এই বাক্যটা নিয়ে ভাবুন।

যদি আপনি ধরেই নেন যে—আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দিচ্ছেন, তিনি চান আপনি কষ্ট পান, আপনাকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করছেন। তবে জীবনে দুঃখ, দুর্দশা আর হতাশা দেখে অবাক হবেন না।

উলটোদিকে, যদি আপনি মানেন যে—আল্লাহ অনেক দয়ালু, তিনি আপনাকে অনেক নেয়ামত দিয়েছেন, তিনি সবসময় আপনার ভালো চান। তাহলে জীবনে সমৃদ্ধি আর আনন্দ দেখে অবাক হবেন না।

দুটোই সম্ভব।

এবার প্রশ্ন হলো, যাদেরকে দরিদ্রতা, দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তারপরও তারা হাসিখুশি, কৃতজ্ঞ—তাদের সম্পর্কে কী বলবেন? তাদের পরিস্থিতি নিয়ে আসলে কিছু করার নেই, পুরোটাই তাদের সিদ্ধান্ত। যা পায়নি তা নিয়ে হা-হুতাশ না করে, বরং যা পেয়েছে তা নিয়ে খুশি থাকাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

বিপরীতভাবে, তাদের ব্যাপারে কী—যাদের অনেক ধনসম্পদ, ভালোবাসা, যশখ্যাতি সব আছে, তারপরও তারা হতাশ, আত্মহত্যা করতে চায়? আবারও বলব, পরিস্থিতি বিবেচনা না করতে। মনোভাবটাই আসল।

আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা রাখা অনেক শক্তিশালী একটা মনোভাব। এটা তিনি আমাদের দান করেছেন। সেটাকে কাজে লাগান।

ভাবনার খোরাক: নিজেকে জিগ্যেস করুন—আল্লাহ্ সম্পর্কে আপনি কেমন ধারণা রাখেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে—আল্লাহ্ আপনাকে প্রচুর নেয়ামত দিয়েছেন এবং তিনি চাইলে আপনাকে আরো দিতে পারেন, আপনার সব স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন? না কি আপনার আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছেগুলো আল্লাহকে বলতে লজ্জা পান? বেশি বেশি চাইলে আপনি অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন বলে মনে হয়?

আবারও বলছি, ইতিবাচক মনোভাবের শক্তি কতটা তা হয়তো নিচের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হবে,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

> "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব।" (সুরা ইবরাহিম: ৭)

কৃতজ্ঞতার মূল হলো ইতিবাচক মনোভাব—জীবন সম্পর্কে, জীবনের সকল জটিলতা সম্পর্কে অধিক ইতিবাচক হওয়া। নেয়ামতগুলো চেনা এবং স্বীকার করে নেওয়া, ইতিবাচকতা ও কৃতজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দুটো যেন জমজ বোন!

সুতরাং যদি আপনি আত্মপ্রকাশ করতে চান, তবে মনে একটা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা খুব জরুরি।

আপনি এখানে আছেন, এর কোনো না কোনো একটা কারণ অবশ্যই আছে। আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, এই জায়গায়, এই সময়ে; যেন আপনি আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। নিজের জীবনে একটা পরিবর্তন আনতে পারেন। তাই সেসব অর্জন করুন। একটা ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব রাখুন, যা আপনার পাথেয় হবে।

নিজের গল্পটা কীভাবে বলবেন:

আমি আপনাদের দুজন নারীর গল্প বলতে চাই, যারা বহুকাল আগে জীবিত ছিলেন।

প্রথমজন, একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভালো শিক্ষাদীক্ষা পান। সুন্দর একটা বিয়েও হয়। কিন্তু শেষে তিনি বিধবা হন। পুনরায় বিয়ে করেন। এবার তালাক পান। তার মানে, তিনি এখন এমন একজন নারী, যে একবার বিধবা হয়েছেন, পরেরবার তালাকপ্রাপ্তা।

তৃতীয়বার যার সাথে তাঁর বিয়ে হলো, সে ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো। যার নেই কোনো খ্যাতি, আর না আছে সহায়সম্বল। অতি শিগগিরই লোকটা তাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্টের কারণ হলো। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারালেন। আপন লোকেরা শহর থেকে তাড়িয়ে দিল, একঘরে করল, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অতঃপর মহিলাটি মারা গেলেন। রইল তাঁর সেই স্বামী এবং সন্তানেরা।

দ্বিতীয় নারীর জন্মও একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে। কিন্তু তাঁর বিয়ে হলো একদম অল্প বয়সে, অনেক বেশি বয়সি একটা লোকের সাথে। স্বামীর শুধু যে বয়স বেশি ছিল তা-ই নয়, একাধিক স্ত্রীও ছিল। জীবনের বেশিরভাগটাই তাঁর কেটেছে দারিদ্র্যে। প্রায় সময়ই খাবার বলতে খেজুর আর পানির পরিবর্তে আর কিছুই ছিল না। না ছিল গর্ব করার মতো এমন কোনো দুনিয়াবি পদমর্যাদা। তিনি অজস্র দুঃখ-কষ্ট আর অপবাদ সহ্য করেছেন। যখন তাঁর স্বামী মারা গেল, তখন তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। শেষ বয়সে দেখাশোনার জন্য কোনো ছেলে কিংবা মেয়েই ছিল না।

এই দুই নারীকে আপনি চিনতে পেরেছেন? আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। প্রথমজন, আমাদের মা খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা., আর দ্বিতীয়জন, মা আয়িশাহ বিনতে আবু বকর রা.।

মানলাম আপনি নারীদ্বয়কে চিনতে পেরেছেন, কিন্তু বর্ণনার ধাঁচটা ধরতে পেরেছেন?

খাজিদা রা.-কে একজন বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা কিংবা তিরস্কারের বিষয় হিসেবে কখনো দেখেছেন?

আয়িশাহ রা.-কে একজন বন্ধ্যা নারী, উপহাসের পাত্রী হিসেবে কখনো দেখেছেন?

আমরা তাদের সম্পর্কে এমনটা কখনোই কল্পনা করতে পারি না। কারণ, একজন মজলুমের দিক থেকে আমরা কখনোই তাদের গল্পটা বলি না। সবসময়ই আমরা তাদের মডেল হিসেবে দেখি।

হ্যাঁ, খাদিজা রা. বিধবা ছিলেন, তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী, একজন সফল নারী ব্যবসায়ী, নবিজির শক্তি এবং মুসলিম উম্মতের প্রাণপাখি ছিলেন। এটাই তাঁর কীর্তি।

হ্যাঁ, আয়িশাহ রা.-এর খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে, সন্তানহীন বিধবা হন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, একটি সাহসী আত্মা, একজন প্রজ্ঞাবতী নারী, হাদিস এবং ফিকহের শিক্ষিকা। এটাই তাঁর কীর্তি।

সবটাই ঐতিহাসিক সত্য। আমরা তাদের কষ্টের জন্য আফসোস করব, না কি তাদের সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করব—পুরোটাই আমাদের হাতে। দুটো ব্যাখ্যাই সহজলভ্য। এই ব্যাপারটা প্রতিটা মানুষের জন্যই খাটে, যারা প্রচণ্ড সংগ্রাম ও দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রকাশ করেছে।

একজন একাকী মায়ের কথা ভাবুন, হাজার দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও যে নিজের সন্তানদের প্রচণ্ড ভালোবাসে, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

সেই বোনটার কথা ভাবুন, যে অনেক বছর ধরে বিয়ের জন্য চেষ্টা করছে। এত সংগ্রামের পরও হতাশ না হয়ে বরং বিশ্বাস অটুট রেখেছে।

সেই বোনটাকে কল্পনা করুন, যে একটা যন্ত্রণাদায়ক বিয়ে থেকে মুক্তি পেয়েছে। নতুন করে ফের সবটা শুরু করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

সেই স্মরণার্থী বোনটার কথা ভাবুন, যে বাড়ি-ঘর, স্বামী, দেশ সবটা হারানোর পরও নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে।

যদি তাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করি, আমরা খুব সহজেই তাদের মজলুম তথা ভুক্তভোগী হিসেবে চিহ্নিত করব, তাদের প্রতি আমাদের দয়া হবে। কিন্তু আমরা যদি তাদের কাজের দিকে দৃষ্টি দেই—কীভাবে তারা এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সামলে নিয়েছে, তবে দেখব তারা আসলে প্রত্যেকে নিজ নিজ গল্পের নায়িকা।

যে গল্পগুলো আমরা নিজেদের বলি:

প্রতিটা গল্পের কমপক্ষে দুটো দিক থাকে। আগের অংশেই আমি সেটা উল্লেখ করেছি। এমনকি সবচেয়ে বেদনাদায়ক গল্পটাও দুইভাবে বলা যায়—একজন ভুক্তভোগীর গল্প, নয়তো একজন নায়কের গল্প।

এবার বলুন, নিজের সংগ্রামের গল্পগুলোকে কতবার আপনি সমস্যা, কষ্ট হিসেবে বর্ণনা করেছেন? বিপরীতে, কতবার সেগুলোকে শক্তি এবং সহনশীলতার উদাহরণ হিসেবে কল্পনা করেছেন? কতবার অন্যের সম্মান এবং ধৈর্য না দেখে বরং তাদের ভুল পদক্ষেপে মনোযোগী হয়েছেন? এবং কতবার আপনি ছোটো ছোটো পরীক্ষাগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা হিসেবে না নিয়ে সেগুলোকে সংগ্রামের চোখে দেখেছেন?

আপনি যদি আমাদের অনেকের মতো হন, তবে বলব, বহুবার আপনি নিজেকে নিপীড়িত হিসেবে কল্পনা করেছেন। হয়তো নিজেকে মজলুম ভেবে ভেবেই আপনি

বড় হয়েছেন। মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গীরাই মজলুম হিসেবে কল্পনা করতে আমাদের উৎসাহ দেয়। কেননা, কষ্টের সময়ে সহানুভূতি পাওয়া খুব সহজ। কিন্তু নিজেকে মজলুম ভাবার একটা খারাপ দিক আছে। এটা আমাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষমতাহীন করে দেয়। ভুক্তভোগীর ব্যাপারটাই এমন—আপনার আর কিছু করার নেই, কোনো সমর্থন নেই, যতটা খারাপ হওয়ার তা হয়ে গেছে, আপনার কাছে আর কোনো বিকল্প নেই, আপনার কোনো দায়িত্ব নেই, আপনি ক্ষমতাহীন।

যখন আমরা বারবার নিজেদের বলব যে আমাদের আর কিছু করার নেই, আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই, তখন কী হবে জানেন? আমরা ঠিক সেরকম আচরণই করব। আমরা হতাশার সাথে লড়াই করা বন্ধ করে দেব, নিজেদের শান্ত করার কথা বাদ দেব। আমরা সেই জিনিসগুলো তালাশ করা ছেড়ে দেব, যা আমাদের সন্দেহ ও কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে। যেমন নামাজ, দুআ এবং অন্যকে সাহায্য করা।

ব্যাপারটা ঠিক একজন ডুবন্ত নারীর মতো যে ধরেই নিয়েছে তার মৃত্যুটা এভাবেই হবে। সেজন্য সে হাল ছেড়ে দেয়, সাঁতার কাটা বন্ধ করে দেয়। যদি সে আশার আলো খুঁজত, তবে কি বেঁচে যেত? হয়তো। সত্যটা হলো, আমরা কোনোদিনও জানতে পারব না।

নিজের মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস অটুট রেখে, তালাকপ্রাপ্ত একটা জীবন পার করতে পারবেন আপনি? হয়তো। আপনি চেষ্টা না করলে আমরা কোনোদিনও জানতে পারব না।

সন্তান হারানোর পরও বিশ্বাস এবং ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন আপনি? হয়তো। আপনি চেষ্টা না করলে আমরা কোনোদিনও জানতে পারব না।

চাকরি হারানোকে নতুন ও ভালো কিছুর প্রাপ্তি হিসেবে দেখতে পারবেন আপনি, যা আপনার স্বপ্নের জীবনের মতো? হয়তো। যদি আপনি চেষ্টা না করেন, তবে আমরা কখনোই জানতে পারব না।

যখনই আপনি কিছু হারানোর কথা ভাবেন, যেকোনো কিছু—এটা ভাববেন, সেই ক্ষতির বিনিময়ে আপনি কী পেলেন? এটা আপনার ইমান বৃদ্ধি করেছে? আপনার মধ্যে স্বীকৃতি, স্পষ্টতা, বিনয়, শক্তি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা বাড়িয়েছে? একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বাড় উন্মোচন করেছে? না কি একটা নতুন জীবনের সূচনা করেছে?

আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে, আমাদের সহ্যের অতিরিক্ত বোঝা তিনি কখনোই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। এই ওয়াদাটা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের ওপর

আলাদাভাবে যেমন প্রয়োগ হয়, তেমনি সমষ্টিগতভাবেও। আল্লাহ্‌ আমাদের অবস্থান, আমাদের চেয়েও ভালো জানেন। তিনি কেবল আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

সুতরাং এটা ভাবুন:

যদি আল্লাহ আপনাকে কোনো পরীক্ষায় ফেলেন, তার মানে আপনি সেটা পাস করতে পারবেন। এটা আল্লাহর আরো কাছে যাওয়ার, নিজেকে চেনার, জীবনের প্রতিটা নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার একটা সুযোগ। এটাকে নষ্ট করবেন না।

পাশাপাশি এটাও ভুলে যাবেন না যে, আমরা সবাই তিনটা পরিস্থিতিতে থাকতে পারি—হয় আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, নয়তো পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, কিংবা ভবিষ্যতে নেওয়া হবে।

সুতরাং, পরীক্ষার সেই ঘন অন্ধকারে থেকে—সেটা যা-ই হোক না কেন—যখন নিজেকে অসহায় মনে হবে, একাকী লাগবে এবং পুনরায় হতাশা গ্রাস করবে, তখন আল্লাহর ওয়াদাটা নিজের অন্তরে গেঁথে নিবেন।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

> "কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"
> (সুরা ইনশিরাহ: ৫-৬)

মেঘ কেটে যাবে। শীঘ্রই ভোর হবে। সুখের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। আপনি শুধু সেই ভোরের অপেক্ষায় থাকুন।

আপনাকে বেছে নিতে হবে, নিজের জীবনের গল্পটা আপনি কীভাবে বলবেন। নিজেকে ভুক্তভোগী হিসেবে দেখাবেন, না কি এমন নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করবেন—যে প্রতিটা সংগ্রাম মোকাবিলা করেছে, প্রতিবার পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, যে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে, যে কখনো আশা ছাড়েনি, বিশ্বাস হারায়নি এবং গল্পটা বলার জন্য এখন অব্দি বেঁচে আছে।

ভাবনার খোরাক: নিজের জীবন নিয়ে এখন কোন গল্পটা আপনি বলছেন? সেই গল্পটাই পুনরায় বললে কীভাবে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করবে?

বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা:

প্রায়শই, আমরা নিজের জীবনের যে গল্পটা বলি, সেটা নির্ভর করে, দীর্ঘকাল ধরে লালন করা কিছু বিশ্বাস ও আদর্শের ওপর। সেই বিশ্বাসগুলো এত পুরোনো আর

এত বেশি প্রমাণিত যে, আমরা সেসবকে সত্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছি; চিরন্তন সত্য, একেবারে পাথরে খোদাই করার মতো।

"আমি সবসময় হাল ছেড়ে দেই..."

"আমি মোটেও চালাক নই..."

"আমি একজন খারাপ মা..."

"আমরা একসাথে কখনোই সুখী হব না..."

"আমার হাতে একদম সময় নেই..."

"আমি কখনোই কিছু অর্জন করতে পারব না..."

বিশ্বাসের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়—এমন কিছু, যা সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়। যা-ই হোক, এখানে আমরা যে বিশ্বাসের কথা বলছি, সেটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা ইসলামের নীতিমালা নয়। বরং আমরা সেই বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছি যা প্রকাশ করে—আমরা কী, আমরা কী না, আমাদের কী হওয়া উচিত, কী হওয়া উচিত না।

বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি প্রথম জেনেছি আমার একজন ভালো বান্ধবী লাইঙ্কা স্যানির থেকে, যে NLP-এর একজন প্রশিক্ষক। সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের চারটা বৈশিষ্ট্য সে উল্লেখ করেছে—

১. পরিচয়,

২. কারণ,

৩. অর্থ এবং

৪. সম্ভাবনা ও বিচার।

এবার এগুলো বাস্তব জীবনে কেমন দেখায় তা উদাহরণ দিয়ে বলি। যেমন, "আমি একজন খারাপ মা"—এটা আপনার পরিচয় সংক্রান্ত সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের একটা উদাহরণ।

সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের কারণটা আরো স্পষ্ট হয়, যখন আমরা এমনতর কথা বলি, "আমি একজন খারাপ মা। কারণ আমার মা দূরে থেকেছেন, আমাকে কখনো ভালোবাসেনি।"

সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের অর্থের দিকটা যদি খেয়াল করি, তবে আমরা একটা জিনিসের যে অর্থ বের করি সেটা। যেমন, "সে সবসময় দেরি করে আসে, কারণ সে আমার পরোয়া করে না।"

সর্বশেষ, সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের সবচেয়ে খারাপ দিকটি বোধহয় এটা—"আমি কখনো এটা করতে পারব না", "আমার সেটা অনুভব করা উচিত নয়" কিংবা "আমার এটা মেনে নেওয়া উচিত"।

ভাবনার খোরাক: আচ্ছা আপনি এমন কোনো বিশ্বাস খুঁজে বের করতে পারবেন, যা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মিলে? সেই বিশ্বাসগুলো কীভাবে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে?

আমরা অধিকাংশই নিজের জীবনটাকে কিছু সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের আদলে তৈরি করে নিয়েছি। আমি সবসময় শুনি, বোনেরা আমাকে বলে—তারা জীবনে খুব বেশি কিছু অর্জন করতে পারল না কেন। সেই ছোটোবেলা থেকে তারা মানুষের সমালোচনা আর অবজ্ঞা শুনে আসছে। এতদিন যদিও তারা সেটা নিজেদের মধ্যে গোপন রেখেছিল, কিন্তু কথায় কথায় তা বেরিয়ে আসে। আমি শুনি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারানোর কথা, আমি শুনি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা, আমি শুনি বাধা এবং প্রতিবন্ধকতার কথা। বেশিরভাগই হলো, সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের ফল, যা এতদিন তারা নিজেদের ভেতর গোপন রেখেছিল। তাদের নিজ নিজ জীবনের গল্পটা বলার সময় এসব প্রকাশ পায়।

মস্তিষ্কের একটা মজার ব্যাপার হলো, আমাদের অনেকের মতোই, সে সবসময় সঠিক হতে চায়। সুতরাং এককালে আপনি হয়তো এই গল্পটা কয়েকবার বলেছেন। ব্যস, মস্তিষ্ক এটাকে আপন করে নিয়েছে, এরপর এমন আচরণ করা শুরু করেছে যা গল্পটাকে বিশ্বস্ত করে তুলেছে। এটাকে বলে কনফারমেশন বায়াস। নতুন নতুন প্রমাণের মাধ্যমে মস্তিষ্ক, তার মধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাসগুলোকে আরো বেশি বিশ্বস্ত করে তুলেছে।

এই বিশ্বাসগুলো আপনার জন্য কতটা ক্ষতিকর তা একবারও কল্পনা করতে পারেন?

ধরুন, কেউ বিশ্বাস করে যে, সে একজন খারাপ মা। কনফারমেশন বায়াসের বদৌলতে, সে তার দুর্বল মানসিকতা দিয়ে আশেপাশের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা শুরু করবে। তার ছেলের পটি ট্রেইনিং ঠিকমতো হচ্ছে না? কারণ, সে একজন খারাপ মা। তার মেয়ে ঠিকমতো রিডিং পড়তে পারছে না, যেখানে ক্লাসের বাকিরা তরতর করে পড়ে যাচ্ছে? এর কারণ, সে একজন বাজে মা। এমন পরিস্থিতিতে, বিপরীতে যত প্রমাণই থাকুক না কেন, মস্তিষ্ক সবটা বাদ দিয়ে, ইতোমধ্যে যা বিশ্বাস করেছে, তাতেই সমর্থন দেবে।

একই কাজ হয় আমাদের বেলাতেও; যখন নিজের, জীবনসঙ্গীর, সন্তানের, পিতামাতার, বন্ধু বা সহকর্মীর কথাগুলো বলতে চাই।

ভাবনার খোরাক: কিছুটা সময় নিয়ে নিজের সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের প্রতি মনোনিবেশ করুন। সেটা হতে পারে আপনার নিজের সম্পর্কে, কিংবা অন্যের সম্পর্কে। কনফারমেশন বায়াসের ভূমিকাও খুঁজে বের করুন। নিজের এবং অন্যকে নিয়ে কিছু অনুমান করার আগে ভাবুন। বিশেষ করে, যদি সেসব অনুমান কোনো কাজেই না আসে।

প্রায়ই, আমরা যা বিশ্বাস করি, ধারণা করি—সেসব আমাদের কোনো কাজে আসে না। উলটো আমাদের সীমাবদ্ধ করে ফেলে, দুনিয়ায় আমাদের বিচরণকে প্রভাবিত করে। কারণ এগুলো বহুল পরিচিত এবং সংখ্যায়ও অনেক বেশি। আমরা নিজেকে এসবের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখি, কারণ আমরা সবসময় এমনটাই জেনে এসেছি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে এসবের সাথে আমাদের লেগে থাকার কারণটা হলো—এসবকে আমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছি। ঠিক এই জায়গাতেই আমরা আছড়ে পড়ি।

জেনে রাখুন:

যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস আপনার ক্ষেত্রে কোনো কাজই করছে না, সেসব পালটে নতুন উপকারী বিশ্বাস গ্রহণে আপনি স্বাধীন। নিজেকে নতুন করে জাগানো এবং নতুন জীবনের গল্প বলার ক্ষেত্রেও আপনি স্বাধীন। সবটাই আপনার ভেতরের শক্তি, যা আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন।

মনে রাখবেন, সবটাই সম্ভব।

যদি কোনো বিশ্বাস আপনার জন্য কাজ না করে, আপনাকে পেছন থেকে টেনে ধরে, তবে সেটা স্বীকার করুন। এরপর সেই বিশ্বাসটা পরিবর্তন করতে নতুন কোনো বিশ্বাসের ওপর কাজ করুন। এমন কিছু যা ইতিবাচক, আরো বেশি উপকারী—নিজেকে সঠিকভাবে, বিনীতভাবে প্রকাশের জন্য উপযোগী।

ভাবনার খোরাক: আপনার সেই দীর্ঘমেয়াদি বিশ্বাস কোনগুলো, যা আপনার সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে? এখন সেগুলো বদলাতে আপনি কী করবেন?

একবার লাইঙ্কা তার ওয়ার্কশপে পরিবর্তনের একটা অনুশীলনের কথা বলেছিল, যা আপনাদের হয়তো উপকারে আসতে পারে। আপনার সীমাবদ্ধ বিশ্বাসগুলো

অতীতের ক্রিয়া ব্যবহার করে লিখুন। এমনভাবে, যেন আপনি সেগুলো আগে বিশ্বাস করতেন, এখন আর করেন না। সেসব কাটিয়ে উঠেছেন, আপনি বড় হয়েছেন, সেগুলোকে আপনি আর সত্য বলে মানেন না। যেমন,

"আমি ভাবতাম, আমি একজন বাজে মা..."

"আমি ভাবতাম, আমরা একসাথে সুখী হতে পারব না..."

"আমি ভাবতাম, হিফজ করার জন্য যথেষ্ট সময় আমার হাতে নেই..."

"আমি ভাবতাম, আমি কোনো কিছুই অর্জন করতে পারব না..."

এখন আপনার কেমন লাগছে? একটু বেশি হালকা আর স্বাধীন মনে হচ্ছে না?

আপনাকে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে। হয় সেই বিশ্বাসগুলো নিয়ে থাকবেন, যেগুলো আপনার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। নয়তো সেগুলোকে পরিবর্তন করে এমন কিছু বিশ্বাস লালন করতে হবে, যা আপনার জন্য উপকারী এবং যা আপনাকে সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষে পরিণত করবে।

একবার ভাবুন, আপনার জীবনটা কীভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে, যখন কোনো একটা সীমাবদ্ধ বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে শক্তিশালী কোনো বিশ্বাসে সেটাকে পালটে দেবেন। এরপর এমনভাবে জীবনযাপন করবেন যেন এটাই সত্য।

স্রেফ একবারটি ভেবেই দেখুন না।

* * *

ধাপ-৩:

শোকরগুজার হোন

اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

"আর তোমার অনুগ্রহে, তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।" (সুরা নামল: ১৯)

যদি ইতিবাচকতা আত্মপ্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়, তাহলে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে, যা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সেটা হলো কৃতজ্ঞতা।

আমি বিশ্বাস করি, প্রাণপ্রিয় স্বামীর মৃত্যুর পর আমি যে সিজদাহতে পড়ে গেলাম, তার একমাত্র কারণ ছিল কৃতজ্ঞতা। অনেকেই এই কাজটাতে প্রশ্ন তুলেছে। কেউ কেউ ভেবেছে, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমি জানি, সেই সিজদাহটা কোথা থেকে এসেছে। এটা এসেছে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে। কারণ, আমি আশীর্বাদস্বরূপ কিছু বছর পেয়েছি, একসাথে সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটানোর জন্য। সিজদাহটা এই স্বীকারোক্তি থেকে এসেছে যে, ঐ মানুষটার কাছে আমি ঋণী। আমি তাকে চিনেছি, তার সন্তানদের পেটে ধরেছি, তার সাথে হেসেছি, কেঁদেছি—সবটার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

স্বামীহীন কাটানো প্রথম ঈদে, আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই কবিতাটা লিখেছিলাম। খানিকটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে।

যখনই সে বলে তার প্রিয়তমের কথা
নয়নমণি যেন ফিরে পায় উজ্জ্বলতা
এখনও,
তার কণ্ঠস্বরে বয়ে যায় শীতলতা
এখনও,
হৃদয়কূলে আঘাত হানে স্মৃতির পাতা

এখনও।
যখনই সে বলে তার প্রিয়জনের কথা,
ভারী হয়ে ওঠে যেন হৃদয়ের ব্যথা!
অল্পেও পাওয়া যায় সুখের দেখা,
তার স্মরণেও মুছে যায় ক্ষতের রেখা।
জানার মাঝেও প্রশান্তি আছে এই কথাটি,
এক জীবনে তারই ছিল সেই পুরুষটি।
অদ্ভুত সেই অনুভূতি,
অসম্ভব সুন্দর ছিলেন তিনি।
তাই তো এপ্রিলের সূর্যরশ্মির ন্যায়,
হাসতে হাসতে তার চোখ হতে অশ্রু গড়ায়।
মুখে হাসি ফোটাতে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে
আরেকটু বেঁচে থাকতে,
এখনও।

কৃতজ্ঞতাই সেই জিনিস, যা স্বামীর মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে আমাকে সাহায্য করেছে। এর ক্ষমতা এত ব্যাপক।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, জীবনে ইতিবাচক হতে বাধ্য করে। ছোটো ছোটো আশীর্বাদ, বরকত—যা আমরা নিজেদের প্রাপ্য হিসেবে ধরে নিয়েছি, সেসবের শুকরিয়া আদায় করতে সাহায্য করে। এটাকে অভ্যাস বানানোর ফায়দা অনেক। যেমন, দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে, নেতিবাচকতাকে হারাতে, আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতে, জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে সহায়তা করে। জগদ্বিখ্যাত উদ্যোক্তা এবং বক্তা, লিসা নিকোলস, তার বই *অ্যাবানড্যান্স নাউ*-তে বলেছেন, "যদি আপনি চান যে আপনার জীবনে মহৎ জিনিসগুলো আসুক। তবে প্রথমেই, জীবনে ইতোমধ্যে যেসব মহৎ জিনিস আপনি পেয়েছেন, সেসব আপন করে নিন। সবার আগে সেসবের প্রতি আপনার শক্তি ও মনোযোগ দিতে হবে।"

যেসব ভালো জিনিস আমাদের জীবনে আছে, সেসবে নিজেদের শক্তি ও মনোযোগ দেওয়ার ফলে আমরা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারব। আমি আমার সন্তানদের কথা ভাবি—তাদের প্রতি কতটা শক্তি আর মনোযোগ আমি দিয়েছি? আল্লাহ তাদের পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য, তারা যেমন আছে তেমন থাকার জন্য,

সন্তান নামক আমানত আমাকে প্রদান করার জন্য—কতটা কৃতজ্ঞ হয়েছি? মা হওয়ার বিরক্তি ও মানসিক যাতনার পরিবর্তে কৃতজ্ঞ হলে—সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারটায় কতটা পরিবর্তন আসবে?

দৃষ্টিভঙ্গির এমন পরিবর্তন, আমাকে কতটা পরিবর্তন করবে? তাদেরই বা কতটা করবে?

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের এই প্রশ্নগুলো করতে পারি। সেটা হতে পারে নিজেকে নিয়ে, জীবনসঙ্গী সম্পর্কে, সন্তানদের নিয়ে, পিতামাতার ব্যাপারে, বড় পরিবার নিয়ে কিংবা বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে। এই কৃতজ্ঞতার প্রভাবটা আমরা আমাদের কর্মজীবন, জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সকল পরিস্থিতিতেও কাজে লাগাতে পারি।

আবারো আমি আপনাকে আল্লাহর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—"*যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব।*"

আমরা কতটা শুকরিয়া আদায় করি, আর আল্লাহ্ আমাদের কতটা দান করেন—দুটোর মাঝে একটা মধুর সম্পর্ক আছে। মুসলিম হিসেবে আমরা জানি—শুকরিয়া আদায় করার জন্য যা যা করা দরকার, সবটাই আমাদের করা উচিত। যেমন, একটা কৃতজ্ঞতার রোজনামচা রাখতে পারি, স্টিকিনোট দেওয়ালে লাগিয়ে অথবা মোবাইলে রিমাইন্ডার সেট করতে পারি। সকাল এবং সন্ধ্যার আমলগুলোও করতে পারি—যেখানে আমরা নিয়মিতভাবে প্রতিদিনকার নেয়ামতগুলো জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি।

ভাবনার খোরাক: কীভাবে আপনি নিজ জীবনে আরো বেশি কৃতজ্ঞ হতে পারেন? জীবনে কৃতজ্ঞতা ও ইতিবাচকতা নিশ্চিত করতে প্রতিদিন কোন কাজগুলো করতে পারেন?

জীবনের পাঠ:

জেনে রেখো তুমি,
জীবনের পাঠ শিখতে পারবে কেবল,
জীবনযাপনের মাধ্যমে,
ভালোবাসার মাধ্যমে,
শ্রবণের মাধ্যমে।

ব্যর্থতায় হোঁচট খেলে,
ভগ্নহৃদয়ের টুকরোগুলো কুড়ানোর মাধ্যমে।
ভগ্নাংশসমূহকে একত্র করো।
এগুলো তো তোমারই জীবনের অংশ!
ধুলো মুছে সব পরিষ্কার করো,
ঘষেমেজে করো উজ্জ্বল!
অতঃপর,
নিজের সাথে জুড়ে গড়ো এক নতুন অস্তিত্ব।
পুরো যাত্রাজুড়ে
আমাদের কেবল আছে,
ধুলোয় ধূসরিত দুটো পা,
একটি মুক্ত হৃদয়
আর তীক্ষ্ম চক্ষুজোড়া,
নিজ নিজ গন্তব্য দেখার জন্য।

* * *

ধাপ-৪:

হিম্মত রাখুন

"সাহসের শুরুটা হয়—নিজেকে প্রকাশ করা এবং অন্যের সামনে নিজেকে উপস্থাপনের মাধ্যমে।"—ব্রেন ব্রাউন

মাঝে মাঝে আমরা ভাবি, সাহসী হতে হলে আমাদের ভয়হীন হতে হবে। কিন্তু সাহস হলো, আপনি যে কাজটা ভয় পান, সেটাই এক হাতে আশা নিয়ে, আরেক হাতে ভয় নিয়ে করা। আপনার ভয়কে আপনি সাথে নিয়েই চলেন। ভয় থাকা সত্ত্বেও আপনি সেই কাজটাই করেন।

সাহসের এই ধারণাটা মূলত ব্যাপকভাবে স্বাধীন। সাহসী হতে হলে, নিজেকে প্রকাশ করার আগে আপনার সমস্ত ভয়কে জয় করার প্রয়োজন নেই। আপনি সেসব ভয়ভীতিকে সাথে নিয়েই চলবেন এবং নিজেকে প্রকাশ করবেন।

আবারো তাওয়াক্কুলের কথা বলা যাক, মানে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। আমরা ভয় পেতে পারি, অনিশ্চয়তা ভর করতে পারে, সব প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকতে পারে—কিন্তু আমরা জানি আমাদের একজন রব আছেন, যিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, সবকিছু জানেন, সবটা দেখেন, যেকোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। পাশাপাশি তিনি আমাদের ডাকের অপেক্ষায় আছেন, আমাদের দুআ কবুলের জন্য সদা প্রস্তুত। তিনি আমাদের সান্ত্বনা দেবেন, সমস্যা দূর করবেন কিংবা ধৈর্য ধরার ক্ষমতা দেবেন। যদি আমরা সত্যিই এই ব্যাপারটাকে ভাবনার খোরাক করতে পারি—কোনো একটা উপায় বের হবেই, তবে তা হবে সীমাহীন সাহসীকতার ভান্ডার।

সারা জাহানের মালিক আপনার সাথে আছেন, তবে আর ভয় কীসের?

সালাতুল ইস্তিখারার ব্যাপারটাই দেখুন। যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর মর্জি জানার জন্য আমরা যা বলি—

"প্রভু হে, আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই, আপনার ইলমের সাহায্যে। আপনার কাছে শক্তি কামনা করি, আপনার কুদরতের সাহায্যে। আপনার

কাছে অনুগ্রহ চাই, আপনার মহা অনুগ্রহ থেকে। আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সর্বজ্ঞ, আমি কিছুই জানি না। আপনিই সকল গোপন বিষয় পূর্ণ অবগত।

প্রভু হে, আপনার ইলমে এ কাজ আমার দ্বীন, আমার জীবনজীবিকা ও কর্মফলের দিক থেকে (অথবা দুনিয়া ও পরকালের দিক থেকে মন্দ হয়) তবে তা আমাকে করার শক্তি দান করুন। পক্ষান্তরে আপনার ইলমে এ কাজ যদি আমার দ্বীন, আমার জীবনজীবিকা ও কর্মফলের দিক থেকে, তবে আমার ধ্যান-কল্পনা এ কাজ থেকে ফিরিয়ে নিন। তার খেয়াল আমার অন্তর থেকে হটিয়ে দিন। আর আমার জন্যে যেখানেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে এর ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে এরই পর সন্তুষ্ট করে দিন।" (বুখারি)

একটু থেমে ভাবুন। আমরা তাঁর কাছে কল্যাণ চাইছি—তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার ওসিলা দিয়ে। আমরা আমাদের কাজের বরকত চাচ্ছি, কাজটা সহজ হওয়ার কামনা করছি। আবার কাজটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক না হলে, এর থেকে পানাহ চাইছি। পরিবর্তে মঙ্গলজনক কিছু আশা করছি। সুবহানাল্লাহ।

সবকিছুই তো চাওয়া হয়ে গেল। এবার আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর ওপর ভরসা করুন এবং কাজে লেগে পড়ুন। লিসা নিকোলস যেমনটা বলেছে, "কাজে নামার আগে ভয়কে দেবেন না আপনাকে থামাতে। বরং ভয়ের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

আপনাদের একটা সত্য কথা বলি। সারাটা জীবন ধরেই আমি ভয় পেয়ে চলেছি।

- নিজের বাসা জিম্বাবুয়ে ছেড়ে, একা একা লন্ডনে পড়াশোনা করতে যেতে আমি ভয় পেয়েছিলাম।
- জীবন এবং বিশ্বাস সম্পর্কে জানার জন্য সেনেগাল যেতে ভয় পেয়েছিলাম।
- আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি—এই কথাটা বাবাকে বলতে ভয় পেয়েছিলাম।
- *ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস* বইতে নিজের জীবনের গল্পটা বলতে ভয় পেয়েছিলাম।
- ব্রিটিশ টিভিতে প্রথম নিকাবি হিসেবে বক্তৃতা দিতে ভয় পেয়েছিলাম। লরেন ক্যালি এবং ম্যালানি ফিলিপস-এর মতো ব্যক্তিদের মুখোমুখি হতেও ভয় পেয়েছিলাম।
- বাচ্চাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাসায় পড়ানোর ব্যাপারেও ভয় পেয়েছিলাম।

■ স্বামীর ব্যবসায়ের হাল ধরা, তার কীর্তিকে বহাল তবিয়তে রাখতেও ভয় পেয়েছিলাম।

■ নতুন কোনো দেশে, নতুনভাবে জীবন শুরু করতেও ভয় পেয়েছিলাম।

■ একটা মৃতপ্রায় ব্যবসায় বন্ধ করে দিতেও ভয় পেয়েছিলাম।

■ একটা নতুন ব্যবসায় শুরু করতেও ভয় পেয়েছিলাম।

■ আমি আবার বিয়ে করছি—প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়িকে এই কথাটা বলতেও ভয় পেয়েছিলাম।

■ আমি আরেকটা বিয়ে করতে চাই না—স্বামীকে এই কথাটা বলতেও ভয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু এর সব কয়টাই আমি করেছি।

কেননা, থেমে থাকা, থমকে দাঁড়ানোর জন্য ভয়ভীতি কোনো কারণ নয়। বরং ভয় এমন এক জিনিস, যা নিজেকে ধাক্কা দিতে সাহায্য করে। কারণ, ভয়ের উলটো পিঠে আছে—শক্তি, প্রজ্ঞা এবং উন্নতি। আর আমার জীবনে আমি সবসময় এটাকে সত্য হতে দেখেছি।

নিঃসন্দেহে, দুর্বল এবং সবলের তফাত হলো—প্রথমজন পরাজয়কে ভয় পায়। আর দ্বিতীয়জন মনে করে, পরাজয় হলো শেখার একটা প্রক্রিয়া। এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো এটা আপনার জন্য নতুন শিক্ষা। তাছাড়া, যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা দুটোই আল্লাহর হাতে—তবে আমরা ভয় পাব কেন?

ভাবনার খোরাক: কোন ভয়টা আপনাকে আত্মপ্রকাশ করতে বাধা দিচ্ছে? কখনো আপনি ভয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন? সেখান থেকে কী শিখেছেন?

ভয়কে জয়:

> "যদি জানতেন, যে জিনিসগুলোকে আপনি ভয় পেয়েছিলেন, সেগুলো আদতে বিশ্বাস বাড়ানোর একটা সুযোগ ছিল—তবে আপনি কী করতেন?"
> —লিসা নিকোলস

সচরাচর আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় পাই। আমি যে কাজটা করার কথা ভাবছি, সেটা হয়তো ব্যর্থতা বয়ে আনবে, আমি হতাশ হব, নয়তো কিছু একটা হারাব।

কিন্তু সত্যটা হলো, আমরা ভবিষ্যৎ জানি না। কেননা, ভবিষ্যৎ দেখা যায় না। অথচ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে করে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভবিষ্যৎ নিয়ে করা নেতিবাচক কল্পনাগুলো মস্তিষ্ক সত্য বলে মেনে নেয়। যতক্ষণ অব্দি সেসব অনিবার্য সত্যি না হচ্ছে, ততক্ষণ অব্দি আমরা তাতে জল ঢালতে থাকি।

কিন্তু সত্যটা হলো, আমরা কল্পনায় একটা জগৎ তৈরি করছি আর এমন আচরণ করছি যেন সেই কল্পনাটাই সত্য। আসলে কিন্তু এমনটা নয়। এটা নিছকই আমাদের কল্পনা।

এই মুহূর্তে আপনি কোন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার কথা ভাবছেন, যা আপনাকে আপনার কমফোর্ট জোন থেকে বের করে দেবে? বাহিরে কাজ করা বা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আনার মতো সহজ এগুলো?

আপনি কুরআন হিফজ করার কথা ভাবছেন? না কি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করছেন? সন্তানদের বাড়িতে পড়াবেন? না কি ইউরোপে পাড়ি জমাবেন? কোনো ব্যবসায় বা দাতব্য কিছু চালু করবেন? না কি ইঁদুর দৌড় খেলা বন্ধ করবেন? কিংবা দেশ ছাড়তে চান?

মজার কথাটা হলো, আমাদের অনেকের জন্যই এমনটা স্বাভাবিক যে আমরা যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ে খারাপটা চিন্তা করি। বিখ্যাত পডকাস্টার এবং দ্য ফোর-আওয়ার ওয়ার্কউইক-এর লেখক, টিমোথি ফেরিস আদতে এটাকে সমর্থন করে। তার মতে, আপনার মস্তিষ্ক এসব গোলকধাঁধায় পড়ে যায়, ধীরে ধীরে অধিক নিকটবর্তী হয় আর একসময় আপনার ভয়ের সাথে বসবাস করা শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে একটি শীতের দিনের কথা ভাবুন। আমরা চিন্তা করি—পরিস্থিতি কতটা খারাপ হবে? আর কী হওয়ার বাকি আছে? কাজ করলে আপনি কী পেতেন? কাজ বন্ধ রাখার কারণে আপনার কী ক্ষতি হলো?

ভয়কে পুনর্গঠন করার ব্যাপারটা কী?

বেস্টসেলিং লেখক, স্টিভেন প্রেসফিল্ড, ভয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজ করার মাধ্যমে প্রতিহত করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "ভয় পাওয়া ভালো। সংশয়ের মতো ভয় পাওয়াও একটা নিদর্শন। ভয় আমাদের বলে—আমাদের কী করতে হবে। আমাদের নীতিটা মনে রাখবেন—কোনো কাজ করতে আমরা যত বেশি ভয় পাব, কাজটা করার সম্ভাবনা আমাদের তত বেড়ে যাবে।"

লিসা নিকোলসের মতে, "ভয় আপনার দুশমন নয়। বরং আপনার বন্ধু।"

আমি তার সাথে একমত। এক বিশেষ ধরনের ভয় আছে, যা—

- আপনাকে আত্মতৃপ্তি হতে দূরে রাখবে।
- অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার তাগিদে বেশ রাত অব্দি আপনাকে জাগিয়ে রাখবে।
- স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ভোর ৪.৩০-এ আপনাকে জাগিয়ে দিবে।
- আপনার কপালটা জায়নামাজে ঠেকাতে দেবে, আল্লাহর কাছে নিজ সন্তানের হিদায়ত চেয়ে দুআ করতে সাহায্য করবে।
- আপনাকে পুনরায় নিজের বৈবাহিক সম্পর্কটা ঠিক করতে সহায়তা করবে।
- বাবা-মায়ের থেকে ক্ষমা চাইতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করবে।

ভয়, বিশেষ করে কিছু হারানোর ভয়—একটা শক্তিশালী অনুপ্রেরক হতে পারে। আপনাকে বেছে নিতে হবে—ভয়কে কীভাবে আপনি সংজ্ঞায়িত করবেন?

সিইও হিসেবে আত্মপ্রকাশ:

দীর্ঘ সময় ধরে, "ব্যবসায়ের মালিক" শব্দটার সাথে বিরোধিতা করেছি আমি। আমার কখনোই মনে হয়নি যে শব্দটা আমার সাথে যায়। যদিও প্রায় দশ বছর যাবৎ *সিস্টার্স ম্যাগাজিন* আমি পরিচালনা করেছি। আমি শুধু বুঝতাম—আমার মাথাভর্তি আইডিয়া আছে, আমি সৃজনশীলা, একজন স্বপ্নচারিণী। ব্যবসায় পরিকল্পনায় কী আসলো আর কী গেল, মিটিং, লাভ-লোকসান—এসব নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। সত্যি বলতে, এসব দায়িত্ব আমি নিতেই চাইতাম না।

হাস্যকর না? প্রায় সময়ই যে কারণটা আমাদের আত্মপ্রকাশ করতে বাধা দেয়, তা হলো—দায়িত্ব। আর আমি সেই দায়িত্বটাই নিতে রাজি ছিলাম না।

লম্বা একটা সময় ধরে, এই জিনিসটা আমার ওপর বেশ ভালো কাজ করেছে। আমি সেই মানুষগুলোকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে নিয়েছি, যারা ব্যবসায়িক কাজগুলো করত সীমাহীন আনন্দের সাথে। আমি কেবল সৃষ্টিশীল কাজকর্ম দেখতাম। এভাবে সুলাইমানের (আল্লাহ তার ওপর রহম করুন) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলেছিল।

মৃত্যুর আগ অব্দি, আমার স্বামী মিশরে একটি মার্কেটিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করছিল। তার একটা কল সেন্টারও ছিল, যার গ্রাহক ছিল বহু নামিদামি ব্যক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটা ভবন ছিল কায়রোতে, যেখানে ৩শ' এর অধিক লোক কাজ করত।

কিন্তু আচানক, ব্যবসায়ের কোনো অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই আমি সেটার মালিক হয়ে গেলাম।

সেদিন কোন জিনিসটা আমাকে কোম্পানির পরিচালক হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, আমি আজও জানি না। তার মৃত্যুর ছয় দিন পর কোম্পানি জানল যে, একটা শেষ চেষ্টা না করে আমরা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করছি না। এটা শেষ নয়; আমরা উন্নতি করব, আরো বড় হব।

ইদ্দতের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আমি প্রায় প্রতিদিনই অফিসে যেতাম। ম্যানেজারের সাথে মিটিং, আয়ের রিপোর্ট দেখা, কর্মীদের ব্যাপারে খেয়াল রাখা সবটাই করছিলাম। বিশেষভাবে এমন একটা পরিবারকে সাহায্য করছিলাম যারা সবেমাত্র শোক কাটিয়ে উঠেছে। সেই মানুষগুলোকে দেখলে আমার কষ্ট হতো—যারা আমার মরহুম স্বামীকে মেন্টর এবং বাবার মতো দেখত। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের শোক কাটিয়ে উঠতে খুব পরিশ্রম করেছিল। সেই মানুষটা এদেরকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল, চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করেছিল, কল্পনার পালে হাওয়া দিয়েছিল, স্বপ্নের খোরাক জুগিয়েছিল।

সে তুলনায়, আমি খুবই বাজে বিকল্প ছিলাম। কিন্তু তার রাহে চলতে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। সে যা করতে চেয়েছিল, আমার মতে আমি তার সবটাই করেছি। অথবা, এটাই সর্বোচ্চ যা আমি করতে পারতাম।

আজ তোমার ল্যাপটপ খুলেছিলাম
প্রথমবারের মতো
তোমার ছেলে পাসওয়ার্ড জানতো,
আমি একদমই না।
এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিলাম।
তোমার জীবন কত ব্যস্ততাপূর্ণ ছিল!
তোমার মস্তিষ্ক কতটা সচল ছিল!
চিন্তায় পরিপূর্ণ,
ফোনের নাড়িনক্ষত্র
এবং খদ্দরের চিঠিপত্র।
তোমার দিনগুলো তো এমনই ছিল,

আমার থেকে ভীষণ আলাদা,
দুজন ছিলাম দুজগতের বাসিন্দা।
আমি আমার কাজে ব্যস্ত,
সন্তানদের দেখাশোনা,
গৃহস্থালি পরিচালনা,
লেখালিখি করা,
বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতা।
আর তুমি তোমার কাজে।
এখন আমি বাধ্য!
তোমার জগতে বাস করতে,
তোমার আবরণ পরতে,
তোমার পথে চলতে।
কিন্তু রাস্তা বেশ দীর্ঘ আমার জন্যে।
অবশ্যই।
আমি অভ্যস্ত নই সেই পথে।
কিন্তু দেখো,
আমি ঠিক পারব সামলে নিতে,
পরম করুণাময়ের রহমতে।
শুধু কিছু সময়ের জন্য অদলবদল করতে হবে,
যতক্ষণ না আমার পা'দুটো দৃঢ় হবে,
যতক্ষণ না তারা নিজেদের গতি পাবে,
যতক্ষণ না আমি হাঁটব, দৌড়াব
অতঃপর ছুটে চলব প্রবল বেগে।
যদবধি না জেতার জন্য প্রস্তুত হব এই যুদ্ধে।

কিন্তু এটা কঠিন ছিল। ভেতরে ভেতরে নতুন এই দায়িত্বটা নিয়ে আমি কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলাম। কেননা, সপ্তাহজুড়ে আমাকে সন্তানদের থেকে দূরে থাকতে হতো। কায়রোর প্রাণকেন্দ্রে, জ্যামের মধ্যে, এটা এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র ছিল—যা আমার নিজের সৃষ্টি নয়। আর যার কোনো তলানিও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

নিজের যাত্রার ব্যাপারেও আমি ছিলাম অজ্ঞাত। কোনো নির্দেশনা নেই, স্বপ্নহীন, মনে ব্যর্থতার ভয়। পাশাপাশি এও ভাবতাম—আমার স্বামীর কীর্তির ব্যাপার কী? কর্মীদের এবং আমার নিজের ব্যাপারটাই কী? কোনো এক ডিসেম্বরে, ব্যবসায় জগতের দুই নেতার কথা শুনে আমার হাবভাব বদলে গেল।

প্রথমজন, ব্রেনডন বারচার্ড। আমি দীর্ঘদিন ব্রেনডন এর ছাত্রী ছিলাম। তার কিছু কোর্স করেছি আমি, কয়েকটা ভিডিয়োও দেখেছি। কিন্তু একদিন সে আমাকে এমন একটা মেইল পাঠায়, যা আমাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। মেইলের মূল বক্তব্য ছিল—নিজের জীবনের সিইও হওয়া, উপাধিটাকে স্বীকার করা, দায়িত্বগুলো মেনে নেওয়া, নেতার মতো আত্মপ্রকাশ করা। ভুক্তভোগী না হয়ে বরং রাজার মতো—বাস করা, চিন্তা করা, কাজ করা।

পরের গল্পটা সংক্ষেপে বলি। একদিন সেথ গডিনের *লিঞ্চপিন* বইটা হাতে তুলে নিলাম। সেসময় ব্যবসায় সংক্রান্ত বই খুব বেশি পড়া হয়নি। সত্যি বলতে, ঐ বইটা আমি কেন বেছে নিয়েছিলাম নিজেও জানি না। তবে আমি শুকরিয়া জানাই যে, আমি বইটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। কেননা তারপরই আমার জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসে।

সেই বইতে, সেথ গডিন কোনো কাজে ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ও ভিন্ন চরিত্র আনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তার মূল কথা ছিল—'আপনি খাবার পরিবেশক বা বিক্রয়কর্মী যা-ই হোন না কেন, কাজে নিজের আসল সত্তাকে আনুন। কাজটা এমনভাবে করুন যা আপনাকে বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে অপরিহার্য করে তোলে।' সেথ আমাকে লিঞ্চপিন হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল—ঘূর্ণির চাকা না হয়ে, বরং নিজ কোম্পানিতে অপরিবর্তনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠতে বলেছিল।

সেথ আমাকে আরো চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল—সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে। নিজের ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কীত প্রতিটা মানুষের কল্যাণে, নিজের আসল সত্তাকে বাহিরে নিয়ে আসতে। এটাই আসলে গোটা খেলার দান পরিবর্তন করে দিল।

সেইদিনের পর থেকে, ব্যবসায়টাকে আমি নিজের ব্যবসায় বলে ভাবতে লাগলাম। কোম্পানির পরিচালনা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করলাম—কেমন সংস্কৃতি আমি গড়তে চাই, কোন ধরনের অভিজ্ঞতা আমি আমার কর্মীদের থেকে আশা করি। আমি সেই সব প্রজেক্ট চালু করলাম, যা আমার লক্ষ্যের সাথে মিলে। কর্মীদের আচরণ ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির জন্য আমি অর্থ ব্যয় করলাম। আমি এমন একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে চাইলাম, যেখানে আমার আদর্শ ও কীর্তি প্রতিফলিত হবে।

আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি। কোম্পানির জন্মদাতার বিকল্প হিসেবে নয়। বরং বর্তমান মালিক হিসেবে; যে কোম্পানির ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্বশীল।

নতুন চরিত্রে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত, নতুন প্রতিকূলতাগুলো, সুযোগগুলো, দায়িত্বগুলো—আমার হতাশা কমিয়েছে। জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আমি আর দৌড়ে পালাচ্ছি না, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি না। আমার জন্য যে শিক্ষা অপেক্ষা করছে, সেটা মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। এসব সত্ত্বেও, আমার বিশ্বাস—স্বামীর মৃত্যুর পর এটাই আমার সবচেয়ে ভালো কাজ।

আপনিও পারবেন:

আল্লাহর ওয়াদা সত্য—আপনার সহ্যের অতিরিক্ত বোঝা তিনি চাপিয়ে দেবেন না।

যদি তিনি আপনাকে কোনো সমস্যায় ফেলেন, তবে তিনিই আবার আপনাকে সেখান থেকে বের করে আনবেন।

আমি জানতাম, আল্লাহ আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, তার পেছনে কারণ আছে। এবং এটাও জানতাম, আমার চেষ্টার ফলাফল তার হাতেই। আমি কেবল এটা বলার হিম্মত চেয়েছি—প্রতিকূলতাগুলো আমি মেনে নিলাম ও নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করলাম।

মিশরে, একটা কোম্পানি চালানোর অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। নিজের আরামের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা, যা আগে কখনো করিনি; শ'খানেকের ওপর কর্মী, যাদের কাউকে আমি চিনি না; হিসাবরক্ষক; উকিল; ট্যাক্সের মামলা; কর্মী নিয়োগ দেওয়া; ছাঁটাই করা—সবটাই আমার জন্য নতুন ছিল। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ সেটা।

পেছনের দিকে তাকিয়ে বলতে হচ্ছে—খুব সম্ভবত এটাই আমার জীবনের সর্বোচ্চ পরিবর্তনের কাজ। এই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, আমি এমনভাবে পরিপক্ক হয়েছি, যেমনটা কোনোদিন আশাও করিনি। এমন সব দক্ষতা অর্জন করেছি, যা কোনোদিন ভাবিওনি যে এসব আমার কাজে লাগতে পারে। এমন এক শক্তির দেখা পেয়েছি, আমি জানতামই না, যা কি না খোদ আমার মধ্যেই বিদ্যমান আছে। সবটাই আল্লাহর করুণা।

সংগ্রাম এবং পরীক্ষার সবচেয়ে পাগলাটে দিকটা হলো—এগুলো আমাদের উন্নয়ন ও বড় হওয়ার নেপথ্যের কারণ।

সামনে বিদ্যমান আগুনের কাছে আমাদের চরিত্রগুলো যেন নকল, কৃত্রিমতায় ঠাঁসা।

■ সেই সময়টা, যখন পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে, সাধারণ মানের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি ভর্তি হলেন। আর দেখলেন, আপনি সেখানে এত উন্নতি করেছেন যা কেউ কখনো আশা করেনি।

■ সেই সময়টা, যখন আপনি কাউকে ভালোবেসে ফেলেছেন, কিন্তু সেই মানুষটা আপনাকে হারাম সম্পর্কের প্রস্তাব দিল। অতঃপর আপনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা আরো ভালো করলেন।

■ সেই সময়টা, যখন আপনি খুব অসুস্থ ছিলেন। মানুষজন ভেবেছিল আপনি বুঝি মরেই গেছেন। কিন্তু আপনি সুস্থ হলেন। কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে ফিরে আসলেন।

■ সেই সময়টা, যখন আপনি কোনো ব্যবসায়তে আপনার মূল্যবান সময়, অর্থ, শ্রম ব্যয় করলেন, কিন্তু সেটা কাজ করল না। এরপর আপনি নতুন আরেকটা ব্যবসায় শুরু করলেন। আর বুঝে গেলেন আপনার জন্য কোন ব্যবসায়টা সঠিক। আপনার বুদ্ধিমত্তা যে মিথ্যা বলছিল সেটা বুঝতেও আপনার আর বাকি নেই। এর ক্রমধারাটা এরকম;

ব্যর্থ পরিকল্পনা
নতুন দায়িত্ব
অবস্থার পরিবর্তন

ভাবনার খোরাক: নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করুন। কতবার আপনি পরীক্ষায় পড়েছেন? ফলাফলস্বরূপ নিজেকে আরো শক্তিশালী হতে দেখেছেন?

প্রায়ই আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিহত করি। এগুলোকে আমরা ভয় পাই। এসব পরিহার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। যখন পরিহার করতে পারি না, তখন সেগুলোকে তাড়িয়ে দেই। আমরা পালিয়ে বাঁচতে চাই, নিজেদের লুকিয়ে রাখি।

আমি জানি, কেননা আমিও এসব করেছি। নিজের কমফোর্ট জোন থেকে আমি বের হতে চাইনি। তাহলে কোন জিনিসটা আমাকে সামনে টেনে নিয়ে আসল?

কমফোর্ট জোন ও নফস:

"গিরগিটি মস্তিষ্ক হলো সব কিছুর মূল"—সেথ গডিন

কমফোর্ট জোন এমন একটা অবস্থান—যেখানে সব কিছু পরিচিত, হাতের নাগালে এবং নিরাপদ। এখানে কোনো অদ্ভুত কাজ নেই, কোনো কঠিন পরীক্ষা নেই, আর

না আছে কোনো হুমকি। কমফোর্ট জোন হলো সেটা—যেখানে আমরা অধিকাংশই থাকতে চাই, নিজেদের কম্বলে মুড়িয়ে নিই, চকলেট খেতে খেতে নেটফ্লিক্স দেখি। এই জায়গাটাতেই আমরা অনেকে দুর্বল কিংবা স্থির হয়ে পড়ে থাকি, নয়তো দূরে সটকে পড়ি। কেননা, কমফোর্ট জোন আমাদের ঘুম পাড়ানি গান শোনায়—যতক্ষণ আমরা এভাবে থাকব, ততক্ষণ সব ঠিক থাকবে; সহজ ও নিরাপদ।

আমি প্রায়ই ভেবে অবাক হতাম—কেন আমাদের অনেকে প্রতিকূলতা ও পরিবর্তন-গুলোকে আলিঙ্গন করে নেয়। লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং স্বপ্নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তবে আমরা কেন ঝুঁকি ও সম্ভাব্য ব্যর্থতার ভয়ে চ্যালেঞ্জে অংশ নেওয়া হতে বিরত থাকি। কেন অধিকাংশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ভালোবাসে আর বাকিরা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যায়? কেন অনেকে নিজেদের সবটা দিয়ে কাজে লেগে পড়ি, আর বাকিরা যা আছে তা নিয়ে সুখী হই?

আপাতদৃষ্টিতে, আমাদের সবার মধ্যেই এই দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই বিদ্যমান।

সেই 'গিরগিটি মস্তিষ্ক' কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কেরই একটা অংশ, যার মাথাব্যথা কেবল বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। এটা মূলত ভয় এবং অনাগ্রহের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ডা. যোসেফ ট্রোঙ্কেল এর মতে (*সাইকোলজি টুডে* থেকে), "লড়াই, ওড়া, খাওয়ানো, ভয়, চুপসে যাওয়া ইত্যাদি হলো এর কার্যকলাপ।" এক কথায় বললে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো।

তাহলে, গিরগিটি মস্তিষ্কের আরেক নাম আমরা বলতে পারি—নফস; ওরফে অহমিকা। এটা আমাদের ভেতরকার সেই স্বার্থপর দিক—যা, যেকোনো মূল্যে আরামে থাকতে চায়, অতিরিক্ত কাজ করতে চায় না এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যা করা দরকার সব করে।

আপনার নফসকে পরখ করুন:

নফস হলো সকল প্রতিবন্ধকতার মূল। সেটা হোক আপনার পরিবর্তন, বেড়ে ওঠা কিংবা চেষ্টা করা। কেননা, পরিবর্তন বা বড় হওয়ার ব্যাপারটা সবসময় সুখকর হয় না। তার জন্য কষ্ট করতে হয়, কাজ করতে হয়। আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গিয়ে সহজ কাজের বদলে কঠিন কাজটা বেছে নিতে হয়। যত কষ্টই হোক না কেন, নিজের নফসকে পরখ করা, তাকে সঠিক কাজটা করতে বাধ্য করা—জিহাদের নামান্তর।

আত্মপ্রকাশের মানে, বাছাই করা—উদাসীনতা না কি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? আশা না কি আকাঙ্ক্ষা? বেড়ে ওঠা না কি স্থির থাকা? আমাদেরকে অবশ্যই নিজের নফসকে জব্দ করতে হবে, ভয়কে জয় করতে হবে।

কেননা, বেড়ে ওঠা, পরিবর্তন, আনন্দ, বেদনাময় যে জীবন—এর শুরুটা আপনার কমফোর্ট জোনের শেষপ্রান্তে। যতদিন আপনি নিজের আরামের জায়গায় থাকবেন, ততদিন কখনোই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেখাতে পারবেন না। এতে করে নিজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় হিম্মত ও ভেতরকার শক্তি অধরাই থাকবে।

কিন্তু আমি কীভাবে জানি?

কারণ, যখন আমরা সবসময় সুরক্ষিত থাকতে চাই, বরাবরই ঝুঁকি এড়িয়ে চলি—তখন নিজের চেনা জায়গাটার বাহিরে যাওয়া আর সম্ভব হয় না। নিজেদের জন্য যে সীমানা মেপে রেখেছি, সেটার বাহিরেও যেতে পারি না। স্রোতে ভেসে থাকতে চাই না। এর মানে হলো, আমরা কোনোদিনও নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না, কখনোই আরো একটু ভালো করতে পারব না। গত বছরের তুলনায়, নিজের বুদ্ধিমত্তাকে একটু বেশি বিকশিত করতে পারব না।

মনে রাখবেন, প্রতিযোগিতাটা সবসময় নিজের সাথে; অন্য কারো সাথে নয়।

সুতরাং, যদি আপনি সাহস রাখার দাবি করেন, তাওয়াক্কুল রাখেন, কেবল আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন—তবে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি কাজ করুন, ফলাফল তিনি দেবেন—নিশ্চিত থাকুন। হেরে গেলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো এটা অমূল্য একটা শিক্ষা, যা আপনাকে আরো দক্ষ করে তুলবে। অতঃপর আপনি বুঝবেন, কোন কাজটা আপনার জন্য, আর কোনটা নয়।

ভাবনার খোরাক: বর্তমানে আপনি কি নিজের কমফোর্ট জোনে আছেন? কোন ভয়টা আপনাকে আটকে রেখেছে—নিজেকে বাহির করতে, অন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে? এর মধ্যে কতগুলো ভয় সরাসরি আপনার নফসের সাথে সম্পর্কিত?

* * *

ধাপ-৫:

স্রোতে গা ভাসান

আপনার জীবনের পরিস্থিতিগুলো, যেখানে আপনি নিজেকে খুঁজে পান—তা সবসময় আদর্শিক হয় না। এমনকি, সবসময়ই আপনি নিজেকে সমস্যা আর প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে দেখবেন, যা আপনাকে চিড়েচ্যাপটা করে দিতে চাইবে। যেমনটা আমি আগে বলেছি, জীবনের সুন্নাহ—আপনি হয়তো পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন, কিংবা এখন যাচ্ছেন, নয়তো সামনে যাবেন।

এই পরীক্ষাগুলো জীবনের যে কোনো পর্যায়ে হতে পারে—আপনার আধ্যাত্মিক জীবন, জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সম্পর্ক, আর্থিক অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক জীবন, কর্মক্ষেত্র বা জীবনের লক্ষ্য।

যে পরীক্ষাগুলোর মুখোমুখি আপনি হচ্ছেন, তা হয়তো আপনার দুনিয়াকে স্থবির করে দিবে, নয়তো আপনার আবেগ ও ইচ্ছেকে অচল করবে। কিংবা, হতে পারে, আপনাকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিবে, যেখানে আপনার কিছুতেই আর কিছু যায়-আসে না। আপনি রীতিমতো হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এই দুনিয়াতে থাকার আপনার আর বিন্দুমাৎর ইচ্ছে নেই।

সেই সময়টার কথা কখনো ভুলব না—যখন প্রথমবারের মতো আমি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে গায়েব হয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

রমজানের সময় ছিল। বাচ্চাদের সাথে মিশরে আমি একা ছিলাম। তাদের বাবা ছিল ইংল্যান্ডে, ব্যবসায়ের কাজে। আমার মানসিক অশান্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে কী বলব। সন্তান লালনপালনের কারণে এমনটা হয়েছে, তা নয়। কাহিনিটা হলো, রমজান মাস! এই রমজান নিয়ে ছিল আমার বিস্তর পরিকল্পনা—কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, প্রতিদিনের আমল, বাচ্চাদের কাজকর্ম, আরো কত কী।

কিন্তু আমার সন্তানরা এর কোনোটাই করছিল না। তারা আমার পরিকল্পনাগুলো রীতিমতো বাতিল করে দিল। আগের মতোই গা ছাড়াভাবে থাকতে লাগল।

যেহেতু তারা আমার পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করছে না, সেহেতু আমার নিজেরই অনীহা চলে আসল। আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম।

- আমার ভুলটা কোথায় ছিল?
- কেন আমার সন্তানরা রমজান ভালোবাসে না?
- তারা কেন ইসলামকে ভালোবাসে না?
- কেন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে না?
- এত বছর ধরে তাহলে আমি কী করেছি? স্রেফ সময় নষ্ট?

কল্পনার জগতে আমি যে চিত্র তৈরি করেছিলাম, তার সাথে বাস্তবতা মেলাতে মস্তিষ্ক হিমশিম খেল। আমি কল্পনায় দেখেছিলাম—পারিবারিক সম্প্রীতি, নামাজ এবং জিকিরে জীবন্ত একটা ঘর। অথচ বাস্তবতা ছিল—একজন হতবুদ্ধ মা, যে তার বাচ্চাদের ঠেলে মসজিদে পাঠাচ্ছে। যে কি না ক্রমাগত তার ধৈর্য হারাচ্ছে।

কিছু একটা ব্যাপার ভেতরে ভেতরে বেশ খোঁচাচ্ছিল। আমার মনে আছে তখন আমি কী ভাবছিলাম—আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি আর এসব করতে পারব না। যদি এটাই আমার জীবন হয়, তবে এমন জীবন আমি চাই না।

আমি আমার সহ্যের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। হয়তো আপনিও এক সময় আপনার সহ্য সীমা অতিক্রম করেছিলেন। সম্ভবত, নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে আপনি ভেবেছিলেন—'নাহ...'

এমনটা হয়।

ধৈর্য, পরীক্ষা, তাওয়াক্কুল এবং ভরসার কথাগুলো আমরা জানি, তাও এমনটা হয়। ব্যাপারটা যতই লজ্জাজনক, কৃতজ্ঞতাহীন এবং আতঙ্কজনক হোক না কেন, এমনটা হয়। এমনও হয়, যখন হতাশা আমাদের জাপটে ধরে ক্রমশ টেনে নিয়ে যায় অতল গহ্বরে।

আমার ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল, যখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম—আমি কী হতে পারতাম, আমার সম্পর্কগুলো কেমন হতে পারত, আমার জীবনটা কেমন হতো? সেই শূন্যস্থানটা এত বড় আর বিশাল ছিল যে, যা বহন করা আমার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল।

ভাবনার খোরাক: আপনার সাথে এই মুহূর্তগুলো কখন ঘটেছে?

লেখালিখির গ্রুপে এক বোন, এই প্রশ্নের জবাবে তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর লিখেছিল। সেটা অনেকটা এমন:

একদিন, সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সে অবশ্য বিস্তারিত বলেছিল। নিজের পরিবার, স্বামী, সন্তান, সবকিছু ছেড়ে সে প্লেনে চেপে বসল এবং অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমাল। যদিও লেখাটা খুব আনকোরা ছিল। তবে আন্তরিকতার কমতি ছিল না। কমেন্টের জোয়ার দেখে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমাদের অনেকের সাথেই এমনটা ঘটেছে।

মাঝে মাঝে এমন হয়—আপনি আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান না, বরং পালিয়ে বাঁচতে চান।

তো, এমন ধরনের মনোভাবকে আমরা কীভাবে প্রতিহত করব? যখন কোনো কিছুই আর আমাদের অনুকূলে থাকবে না, তখন পালিয়ে না গিয়ে উলটো নিজেকে প্রকাশ করব?

উত্তরটা সহজ:

উড়তে শিখুন।

দিনটাকে কবজা করুন:

> আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন, "যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না। আর যখন তোমার সকাল হয়, তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না। অসুস্থ হওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও, আর তোমার মৃত্যুর জন্য জীবিতাবস্থায় পাথেয় জোগাড় করে নাও।" (বুখারি)

মানুষ বড় অদ্ভুত প্রাণী। যখন,

- ছোটো ছিলাম, বড়দের মতো পোশাক পরে বড় বড় ভাব ধরতাম।
- কৈশোরে পৌঁছালাম, বড়দের মতো স্বাধীনতা চাইতাম।
- বড় হওয়ার পর সমস্ত দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপল, আমরা এবার সঙ্গীর তালাশ করলাম। বিয়েতে আগ্রহী হলাম।

■ বৈবাহিক দায়িত্ব আমাদের ওপর আছড়ে পড়ল, আমরা সন্তান কামনা করলাম।

■ অন্তঃসত্ত্বাকালীন অসুস্থতা জেঁকে ধরল, আমরা সন্তান জন্মের প্রার্থনা করলাম।

■ সন্তানের দুধ ছাড়ানো, পটি ট্রেনিং আমাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙে দিল, আমরা তাদের স্কুলে পাঠানোর নিয়ত করলাম।

এরপর,

■ সন্তানকে প্রাইমারি স্কুলে দিলাম। হোমওয়ার্ক আর স্কুলের দুষ্টুমি সামলাতে সামলাতে দিন শেষ।

■ সন্তানদের হাইস্কুলে পাঠালাম। তাদের বেড়ে ওঠা, পরিবর্তন, আর বর্তমান জমানায় ভালো মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার দুশ্চিন্তায় ভুগলাম।

■ দুআ করলাম, তারা যেন বড় হয়, নিজের পায়ে দাঁড়ায়। তারা যেন একটা আলাদা নীড় গড়তে পারে। আমরা একাকীই পড়ে রইলাম। এবার মধ্য বয়সের অনিশ্চয়তা শুরু।

একাকিত্ব, হতাশা, যন্ত্রণার কারণে, এই ধাপগুলো জলদি শেষ হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করা, পরের ধাপে যেতে চাওয়া আমাদের জন্য খুব সহজ। কেননা, প্রত্যেকটা ধাপই খুশি, আনন্দ, সহজসাধ্যতা ও পরিপূর্ণতার প্রতিজ্ঞা করে। পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমরা প্রতিটা ধাপ অতিক্রম করি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যে ধাপটা পরবর্তীতে আসবে, তারও কিছু সংগ্রাম আছে। সে নিজের পরীক্ষা, সমস্যা এবং প্রতিকূলতা নিয়েই আপনার জীবনে আসবে।

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কীভাবে বুঝবেন যে, অন্য ধাপে যেতে আপনি মরিয়া?

এটা জানার সহজ একটা উপায় আছে। যদি আপনি নিজেকে বলতে শুনেন—"আমি সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না, যতক্ষণ না..." তার মানে, আপনি আপনার বর্তমান জীবনটা উপভোগ করছেন না। ঐ কথাটার মানে দাঁড়ায়—বর্তমান জীবন নিয়ে আপনি খুবই হতাশ এবং অসন্তুষ্ট। আরো বোঝায়—আপনি খুব জলদিই এই ধাপটা শেষ করতে চান এই আশায় যে, এটা শেষ হলেই মিলবে শান্তি।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা স্রেফ উপলব্ধির বিষয়। যদি আমরা জীবনের প্রতিটা ধাপকে সবরের সময় ভাবি এবং পরের ধাপের অপেক্ষায় থাকি—তবে বর্তমান জীবনে আমরা কখনোই পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করতে পারব না। আমরা মনোযোগী হতে পারব না, উদ্দেশ্য ঠিক করতে পারব না। আর না পারব আনন্দ করতে।

কেননা, পরের ধাপে যাওয়ার জন্য আমাদের আর তর সইছে না। সেজন্যই, জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে উপভোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছি, যেগুলো আর কখনোই ফিরে আসবে না। কেননা, প্রতিটা ধাপেরই স্বতন্ত্র কিছু নেয়ামত থাকে। যেমন;

- আপনি কখনোই আবার কৈশোরে ফিরে যেতে পারবেন না।
- আপনি কখনোই আবার প্রথম নববধূ হতে পারবেন না।
- আপনি কখনোই আবার প্রথমবার মা হওয়ার অনুভূতি পাবেন না।
- আপনি কখনোই আবার প্রথম প্রসববেদনার অনুভূতি পাবেন না।
- আপনি কখনোই আবার সন্তানের প্রথম হাসি উপভোগ করতে পারবেন না।
- আপনি কখনোই আবার সন্তানের প্রথম হাঁটতে শেখা উপভোগ করতে পারবেন না।

জীবনের প্রতিটা প্রথম অনুভূতি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে, আর ফিরে আসবে না। পুরাতন প্রথমগুলো নতুন প্রথম দিয়ে বদলে যাবে। শেষ দিন পর্যন্ত এমনটাই চলবে। জীবনের প্রথম মুহূর্তগুলো আপনি আর কোনোদিনও ফেরত পাবেন না।

সুতরাং, সেগুলো উপভোগ করুন।

আমার খুব পছন্দের একটা বাক্য হলো—দিনটাকে কবজা করো। প্রতিটা দিন এমনভাবে কাটান, যেন এটাই আপনার শেষ দিন। অতঃপর আপনার সবটুকু ভালো তাতে ঢেলে দিন।

বর্তমানে বাঁচুন এবং সেটাকে বেড়ে ওঠা ও প্রাপ্তির সুযোগ হিসেবে উপভোগ করুন। কেননা, জীবনের প্রতিটি ধাপ নিজ নিজ সংগ্রামের সাথে আসে। পাশাপাশি এর নিজস্ব কিছু প্রাপ্তিও থাকে। প্রত্যেকটা ধাপই আত্মপ্রকাশের জন্য আমাদের আহবান করে। কিন্তু এই নিজেকে প্রকাশ করা আলাদা আলাদাভাবে ধাপের ওপর নির্ভর করে। আমাদের অনেকের হয়তো কিছু ধাপ অন্যগুলোর তুলনায় কিছুটা সহজ এবং আনন্দময় লাগে। কিন্তু প্রাপ্তির সুযোগ সব জায়গাতেই থাকে, ধাপটা যত কঠিন আর প্রতিকূলই হোক না কেন।

আরেকটা উদাহরণ দেই, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দতের ব্যাপারটাই ধরুন। শোক, নিষেধাজ্ঞা এবং আকাঙ্ক্ষার কারণে একজন খুব সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। খুব সহজেই ভাবতে পারে—এটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না।

কিন্তু, এমনটা করলে, আপনি এই ধাপের স্বতন্ত্র প্রতিদান, বন্ধন এবং পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

আমি আমার সেই ইদ্দতের সময়টা কখনো আবার ফিরে পাব না। যদি আমি আবার স্বামীকে হারাই (আল্লাহ না করুন), তবুও না। জীবনের প্রথম ইদ্দত আমি কোনোদিনও ফিরে পাব না।

সুতরাং, নিজেকে শক্ত করার জন্য, চিন্তা করার জন্য, শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সময়টা আপনাকে দেওয়া হয়েছে—সেটা উপভোগ করুন। সেই ধাপ থেকে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করুন, যেন আপনার যা করার ছিল আপনি তার সবটাই করেছেন। এই ধাপে আপনার জন্য যা প্রতিদান বরাদ্দ ছিল, সেটা হাসিল করতে আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

জীবনের প্রতিটা ধাপে যেমন সংগ্রাম আছে, তেমনি সৌন্দর্যও আছে।

আমাদের কেবল নিজেকে প্রকাশ করতে হবে—সেই সৌন্দর্যটাকে চেনার জন্য, তা উৎযাপন করার জন্য এবং নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্য।

এবং প্রতিটা ধাপেই ধৈর্য ধরতে হবে...

ধৈর্য ধরুন:

একটা কথা বলে নেওয়া ভালো—ধৈর্য ছাড়া কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়; কোনো কিছুই না।

ধৈর্য ধরা মানে—অধ্যবসায়ী হওয়া, নিজের কাজটা করা, ফলাফল পরে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা, পরিকল্পনায় লেগে থাকা যদিও ফল পেতে ঢের বাকি। কেননা;

- এভাবেই আপনি কুরআন মুখস্থ করেন।
- এভাবেই নতুন কোনো ভাষা শেখেন।
- এভাবেই নতুন বই লিখেন।
- এভাবেই কোনো একটা কাজের পরিকল্পনা করেন।
- এভাবেই আপনি ব্যবসায় শুরু করেন।

- এভাবেই সদাকার জন্য টাকা জমা করেন।
- এভাবেই আপনি শক্তিশালী হন।
- এভাবেই পরিবার লালনপালন করেন।

আর এভাবেই আপনি প্রতিটা কাজ করেন, যা করা প্রয়োজন—ধৈর্য ধরে, নিজের কাজটাতে মনোযোগী হয়ে।

নবি ইয়াকুব আ.-এর এই কথাটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

"সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়।" (সুরা ইউসুফ: ৮৩)

এটা বুঝতে পারা খুব দরকার যে, জীবনটা ম্যারাথন কোনো দৌড় প্রতিযোগিতা না। আমরা স্রেফ বীজ বপন করছি। আর বীজ থেকে চারা গজাতে সময় লাগে।

সুতরাং নিজেকে প্রকাশ করার আপনার এই যাত্রায়, ধৈর্যের শিল্পকে আপন করে নিন। আর নিশ্চিত থাকুন যে, ফলাফল আল্লাহর হাতে। যদি আপনার উদ্দেশ্য ভালো হয় এবং ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চান, তবে আল্লাহর রহমতে একদিন আপনি ফল পাবেন।

চলুন, জীবনটা পরিপূর্ণ করা যাক, যেভাবে আপনি নিজেকে দেখতে চান। সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করুন। নিজের বাস্তবতাকে মেনে নিন। আর সে আপনার কাছে এখন কী চায়—সেটাকেও।

কেননা, জীবনের বেশ অনেকগুলো মৌসুম থাকে। প্রতিটা মৌসুমই আমাদের কাছে ভিন্ন কিছু চায়। স্বাভাবিক দুনিয়ায় এমনটাই হয়।

- প্রস্তুতির কাল।
- বীজ বপনের কাল।
- ফসল কাটার কাল।
- বিশ্রাম এবং পুনরায় বীজ বপনের কাল।

জীবনটা কয়েক ধাপে বিভক্ত—এটা বুঝলে নিজেকে আরো শক্তিশালী করতে পারবেন। কেননা, এর মধ্যে আছে স্রোত, বহমানতা। আমরা অসার নই এবং

আমাদের জীবনটাও স্থবির না। আমরা একটা চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের জীবনের ধাপের আকাঙ্ক্ষাগুলোও সব সমান নয়। যেমনিভাবে সমান নয়, প্রতিটি ধাপের সুযোগ এবং আশীর্বাদগুলো।

সেজন্য বহমানতা অনেক বেশি জরুরি। আপনি কে, কী হতে পারতেন—এমন চিন্তায় স্থির না থেকে, বরং বুঝুন:

> জীবন চায় আমরা পানির মতো হই—প্রবাহমান, প্রাচুর্যে ভরপুর। যেখানেই যাই, যে নদীতে গিয়ে পড়ি, যে উপত্যকা পার হই, যে হ্রদ বা সমুদ্রে গিয়ে মিশি না কেন—ভালোটাই যেন বয়ে নিয়ে আসি।

স্বচ্ছ পানির মতো—যার শুরুটা পাহাড়ে জমে থাকা শুভ্র কঠিন বরফে। এরপর তা গলে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকে। অতঃপর গিয়ে মিশে বনের নদীতে। এরপর যার ঠাঁই হয় নদী পেরিয়ে কোনো সাগর কিংবা মহাসাগরে। তেমনি আমরাও আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধাপ পার করি। সেই ধাপগুলো—যা জীবনের লক্ষ্যে পরিবর্তন আনে, আমাদের নতুনভাবে তৈরি করে, গড়ে তোলে আরো দক্ষ ও শক্তিশালী করে। নমনীয় হওয়া ও মৌসুমি পরিবর্তন—দুটোই আমাদের আত্ম-প্রকাশের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

ভাবনার খোরাক: আপনি এখন কোন ধাপে আছেন? এই ধাপে কীভাবে আপনার নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়োজন? এই ধাপের দুঃখ ও আনন্দগুলো আলিঙ্গন করতে কি প্রস্তুত আপনি?

একবার কোনো একটা অনুষ্ঠান শেষে এক বোন আমার কাছে আসল। তার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। সে এসে বলল, "মাঝে মাঝে আমার এতটা মন খারাপ হয় যে, আমি আগের মতন কাজ করতে পারি না। আপনাদের মতো দাওয়াহর কাজও করতে পারি না।"

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, "বোন, কোন জিনিসটা তোমাকে কাজ করতে বাধা দিচ্ছে?"

তার জবাব, "আমার চারজন সন্তান। যাদের আমি স্কুলে না দিয়ে বাড়িতেই পড়াচ্ছি।"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। আমি যা দেখছি, তা সে দেখছে না? হাতদুটো ধরে আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম—"বোন, তুমি তো কাজ করছোই! ঠিক আছে? কখনোই অন্যকে এমনটা বলার সুযোগ দেবে না।

তুমি অনেক নেক একটা কাজ করছো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার চেয়ে ভিন্ন অবস্থানে যে আছে, তার সাথে দয়া করে নিজেকে তুলনা করবে না। কম কাজ করার বাহানায় নিজেকে দোষও দেবে না। আল্লাহ্ তোমাকে সন্তান নামক যে নেয়ামত দিয়েছে, সেটাতে তোমার সর্বোচ্চটা দাও। তাদের সাথে জীবনের এই ধাপটা উপভোগ করো। খুব শিগগিরই তুমি দেখবে, তারা বড় হয়ে গেছে। তখন তুমি জীবনের অন্য ধাপে, অন্যভাবে কাজ করতে পারবে। হয়তো সেইভাবে যেভাবে তুমি আজীবন চেয়েছো। সেই পর্যন্ত এখন যে ধাপে আছো, সেটাতে কাজ করো। এটা হক, একে তার অধিকার দাও—তোমার মনোযোগ আর আগ্রহ।"

এখানেই বয়ে চলার সৌন্দর্য:

> যেখানেই আপনাকে রোপণ করা হোক না কেন, আপনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন। আপনার মধ্যে থাকা সৌন্দর্য আর সুবাস সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। যখন যার যেটা প্রয়োজন।

আপনাকে আমি আরেকটা উদাহরণ দেখাই: জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক। আপনি হয়তো একগাদা পরিকল্পনাসমেত আপনার বৈবাহিক জীবন শুরু করেছিলেন—কীভাবে সংসার করতে হয়, কীভাবে সবটা সুন্দর ও সহজ হবে ইত্যাদি। খুব সম্ভবত এটা আপনার প্রথম সন্তান আগমনের আগ পর্যন্ত জারি ছিল। কিন্তু আচানক সবটা বদলে গেল। আবার সেটা ধীরে ধীরেও হতে পারে। আপনারা দুজন দুটো লাভবার্ড আর রইলেন না। আপনারা এখন একটা শিশুর মা-বাবা, যাকে ঘিরেই আপনাদের দুনিয়া। এটা আপনার দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ফেলবে, হয়তো অস্বস্তি লাগবে। সম্পর্কে যথেষ্ট সময় দিতে না পারার কারণে আগের মতো নিজের খেয়াল রাখতে না পারার জন্য কিংবা একদম ক্লান্ত হওয়া, পূর্বের মতো আনন্দ করতে না পারার দরুন নিজেকে ক্রমাগত দুষবেন।

এমনটা যখন ঘটে, তখন হতাশ হওয়া একদম স্বাভাবিক। সবসময় এই ভয়ে থাকা যে, একটি সুনির্দিষ্ট জীবনমান ধরে রাখতে না পেরে আমরা ব্যর্থ।

কিন্তু, জীবনটাই এমন। আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এমনটা হয়।

আসল ব্যাপারটা হলো—আমরা আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ইতিবাচক হতে চেয়েছি।

বাড়িতে বসে ছাত্রীবস্থায় যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত বা হিফজ করতে পারতেন; কাজে গিয়ে কিংবা শ্বশুরবাড়িতে, নয়তো তিন বাচ্চার মা হয়ে নিশ্চয়ই ততটা পারবেন না।

প্রথমবার যখন মা হয়েছিলেন, সবটা যেমন নতুন নতুন লাগছিল; চার বাচ্চার মা হয়ে নিশ্চয়ই আর তেমন লাগবে না। কেননা যেখানে কি না প্রতিনিয়ত বয়সের ভারের সাথে সংসারের বিভিন্ন চাপও যুক্ত হচ্ছে।

আপনি যে বন্ধুটা ছিলেন—একা, স্বাধীন, যেকেনো সময় ডাকলে পাওয়া যায়; ব্যবসায় বা কর্মক্ষেত্রে ঢুকলে নিশ্চয়ই আর তেমনটা থাকবেন না।

সবটাই ঠিক আছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ইতিবাচক এবং সাহসী হওয়ার কথা যদি আপনার মনে থাকে, তবে দেখবেন আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে। আপনার প্রভাবক বৃত্তটা যত ছোটো বা বড়ই হোক না কেন, আপনি একটা ইতিবাচক ও দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন। কেননা, প্রভাবক বৃত্ত পরিবর্তনশীল। কখনো এটার আয়তন বেড়ে যাবে, তো কখনো হয়ে যাবে একদম ছোটো। আপনার কাজ শুধু জ্বলে ওঠা, বাকিটা আল্লাহর হাতে।

এই জায়গাটাতেই প্রবাহের কথা আসে। এটা সেই সময় যখন আপনি ভরসা করতে শেখেন, তাওয়াক্কুল করেন এবং বর্তমানের বাস্তবতাটা মেনে নেন। হ্যাঁ বর্তমানই। এটা কোনো মৃত্যুদণ্ডের আদেশ নয়। এমনটা বিশ্বাস করার একটা কারণ আছে যে, এই দিনগুলোও কেটে যাবে। রাত শেষ হতে চলল, ভোর সন্নিকটে।

সুতরাং, জোরে দম নিন এবং প্রবাহমান পানির মতো হোন।

সাথে আল্লাহর ওয়াদা স্মরণ করুন: "আল্লাহ কারো ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" এটাই সত্য।

এই কথাটা আপনি যত বেশি বিশ্বাস করবেন, তত বেশি শক্ত করে নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন। তত বেশি আপনার অবচেতন মনে এটা গেঁথে যাবে, তত বেশি জীবনের উত্থানপতনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন।

আত্মবিশ্বাস শান্তির দিকে নিয়ে যায়—সেই কথাটা আপনাদের মনে আছে? এটাই বয়ে চলার নির্যাস। মনে মনে বিশ্বাস করা, আল্লাহর সাহায্যে যে কোনো সংগ্রাম আপনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। তিনি আপনাকে সুরক্ষা দিচ্ছেন। এটা মনে রাখা, যা হচ্ছে আপনার ভালোর জন্য হচ্ছে। আপনাকে সহজ-সরল একটা জীবনের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি। বরং আপনি এখানে এসেছেন শিখতে, বড় হতে, নিজেকে উন্নত করতে। এটা আপনি করতে পারবেন কেবল একটা উপায়ে—স্রোতে ভেসে থাকুন। যদি আপনি ডুবে যান, তবে আবার ভেসে উঠুন, সাঁতার কাটতে থাকুন।

থিতু হোন:

এখানে একটা কাহিনি আছে। এক বোন এই অধ্যায়টা পড়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ করল—সব কথাই তো ভেসে থাকা আর প্রশান্তি নিয়ে। এটা অনেকটা স্থায়ীভাবে থিতু হওয়া নয়? আরেকটা কমফোর্ট জোন না?

আমার উত্তর হলো—আপনি জানেন, কখন আপনি লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন; সেটা জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। আপনি জানেন, কখন আপনি ভয় ও অলসতা দেখাচ্ছেন, ঠুনকো অজুহাতে নিজেকে অন্য স্তরে যাওয়া থেকে বিরত রাখছেন; সেটা হতে পারে ইবাদত, ব্যায়াম করা, সন্তান লালনপালন কিংবা আপনার পড়ালেখা। আপনি এটাও জানেন, কখন আপনার সক্ষমতা বেড়ে যায়, কখন আপনি আপনার সর্বোচ্চটা দিচ্ছেন আর কখন দিচ্ছেন না।

এটাই সেই সময়। আপনাকে এখন আয়নায় দাঁড়ানো প্রতিবিম্বটাকে সব সত্য কথা বলতে হবে। কেননা, আপনারা দুজনই সত্যটা জানেন।

আপনি যদি আপনার কমফোর্ট জোনে হাঁপাতে থাকেন, সেটা আপনি জানেন। আপনি যদি আরো বেশি কিছু করার সক্ষমতা রাখেন, সেটাও আপনি জানেন। আর বর্তমানে আপনার সক্ষমতা কতটুকু, সেটাও আপনার অজানা নয়।

সুতরাং আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে হবে—দয়ালু, আত্মবিশ্বাসী, ঘনিষ্ঠ কিন্তু সৎ।

কেননা, যে মানুষটার সাথে আমার প্রতিযোগিতা করা উচিত, সেটা কেবলই আমি। কিন্তু, আমরা যদি নিজেদের ব্যাপারে সৎ না হই, তবে কখনোই পরিপূর্ণভাবে নিজেকে দেখাতে পারব না।

অদ্ভুত নয় কি?
আমরা ভালোবাসি,
একদিন হারাতে হবে জেনেও?
অদ্ভুত নয় কি?
একে অপরকে আঁকড়ে ধরি,
বিচ্ছেদ নিশ্চিত জেনেও?
অদ্ভুত নয় কি?
আমরা জন্মগ্রহণ করি,
মৃত্যু অবধারিত সত্ত্বেও?

ধ্রুব সত্য,
না কি অনুস্মারক?
বড্ড আশ্চর্যজনক!
অদ্ভুত নয় কি?
হৃদয়কূলে ভাঙন নামে
এরপর হঠাৎ জোড়া লাগে।
অতঃপর আবারও ভেঙে যায়,
কেবল জুড়ে দেওয়ার তরে পুনরায়?
পেশিমূল ক্ষত বিক্ষত,
হয়ে যায় ছিন্নভিন্ন!
পোশাকের কারুকাজের ন্যায়
একে অপরের মাঝে মিশে যায়!
ঠিক যেভাবে আমরা আঁকড়ে ধরি,
যেমনিভাবে আগলে রাখেন তিনি।
আমরা ভীষণ অদ্ভুত,
এক বিস্ময়কর সৃষ্টি!
বড্ড বিচিত্র নয় কি?

* * *

ধাপ-৬:

নিজের মতো থাকুন

সেই মুহূর্তটার কথা আমার মনে আছে, যখন প্রথমবারের মতো মনে হয়েছিল—আমি আমার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি।

একরাশ খুশি নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। এখন বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে আছি। ফুটফুটে একটা ছেলে আছে, ভালো একটা সমাজে থাকছি, তারপরও আমার মনে হতো—আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি আয়নায় নিজেকে দেখতাম আর ভাবতাম—যে 'আমি'কে আমি চিনতাম, তার কোনো অস্তিত্বই এখন নেই।

আমরা যখন বিয়ে করি, কিংবা সন্তান জন্ম নেয়, তখন প্রায়ই এমনটা হয়। আমি আসলে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিয়েছিলাম—শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক-ভাবে। আমি অটো-পাইলট মোডে চলছি, রোবটের মতো কাজ করছি। অন্যদের মতো আমিও সেই কাজগুলো করছি, যা আমার কাছে করণীয় মনে হয়েছিল।

- কিন্তু, আমার কি একটাবারও মনে হয়েছে যে, আমি নিজের পুরো সম্ভাবনা নিয়ে জীবনযাপন করছি? মোটেও না।
- জীবন আর জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি উৎসাহী ছিলাম? কখনোই না।
- আমার কখনো মনে হয়েছে যে আমি শিখছি, বড় হচ্ছি, নিজেকে আরো ভালোভাবে তৈরি করছি? একদমই না।

আমি নিজেকে নিজের কমফোর্ট জোনে আটকে ফেলেছিলাম। আর এটা বেশ দৃশ্যমানও ছিল।

আপনি দেখেছেন, এমনটা হওয়ার ছিল না। মাধ্যমিকে আমি অনেক ভালো ফল করেছিলাম। আমি ছিলাম একাধারে একজন অভিনেত্রী, পুরস্কারপ্রাপ্ত বক্তা, নেত্রী। যখন আমি স্কুল ছাড়লাম, তখন সবার বিশ্বাস ছিল একদিন আমি অনেক বড় হব। সবাই বলত আমার মধ্যে তারকা হওয়ার গুণাবলি ছিল।

কিন্তু এরপর, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, আর সবটা কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল। উৎসবমুখর জীবনটা আর নেই। মদ খাওয়া ছেড়ে দিলাম, পার্টি-তে যাওয়া বাদ দিলাম, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া শুরু করলাম, হিজাব ধরলাম।

পরিচিত মহলে রব উঠল—"মেয়েটা রসাতলে গেল।"

তারা চিন্তিত ছিল। কেননা, আমি আমার জীবনটা ছুড়ে ফেলেছি, সাথে সমস্ত সম্ভাবনাও।

সেসময় যখন আমি আয়নায় তাকাতাম, নিজেকে চিনতে পারতাম না। আমি ঐ মানুষগুলোর কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম।

এটাই কি তবে সব? এমনটাই হওয়ার ছিল? আমাকে কি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি?

আমরা অনেকেই, স্বাভাবিকভাবে একটা সুনির্দিষ্ট অভ্যাসে স্থির থাকি। জাঁতা-কলের মতো, আটা পিষেই চলি, পিষেই চলি। আপনার মনে হয়—আপনি যথেষ্ট করছেন না, অন্যের চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারছেন না। এটাই জীবন, আজীবন এভাবেই চলবে—এসব ভেবে আপনি অবাক হন। এরপর শূন্যতা, উদ্দেশ্য-হীনতা, অমনোযোগিতা আপনাকে ঘিরে ধরে।

আমার মনে আছে, একবার আমারও এমন অনুভূতি হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, সেই সময়টার পর অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমি যবে থেকে লেখালিখি শুরু করেছি, তবে থেকেই পরিবর্তনের শুরু। কেননা, শিশুদের জন্য একটা বেস্টসেলার স্মৃতিকথা লেখা থেকে শুরু করে পত্রিকায় লেখা, টিভিতে আসা, সব কিছু ছিল বিশ্বাসের একেকটা ধাপ। আমি সেই কাজগুলো করেছিলাম, যা করার কথা কখনো ভাবিনি। 'না' বলতে চেয়েও 'হ্যাঁ' বলার মুহূর্তগুলো। সেই কাজগুলো করেছি, যা আমি আগে কখনো করিনি। পাশাপাশি নিজেকে একটা ধাক্কা দেওয়া, চ্যালেঞ্জ করা, ভয়ের আবর্জনাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলা, একটা সাহসী জীবন-যাপন করা।

- নিজের জীবনের গল্পটা অপরিচিত কাউকে বলার ভয়কে আমি জয় করেছি।
- প্রথম নিকাব পরিহিতা হিসেবে *জিএম টিভি*তে সাক্ষাৎকার দেওয়ার ভয়কে জয় করেছি।
- স্বামী বিয়োগের ঘটনাটা হাজার হাজার মানুষকে বলার ভয়কে জয় করেছি।

■ আমি নিজেকে ধাক্কা দিয়েছি, বারবার দিয়েছি।

তার মানে এই না যে আমি বিশেষ কেউ। আপনি কিংবা আপনার মতো হাজারো বোনের চেয়ে আমি একদমই আলাদা নই। আমি কেবল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত।

আমাদের সবার মধ্যেই কোনো না কোনো নেয়ামত আছে, যা আমরা দুনিয়াকে দিতে পারি। আমাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে, যা অন্যের কাজে লাগতে পারে। আর সেই বিশেষ কিছুটা হলেন—আপনি; আপনার স্বতন্ত্র সত্তা।

যদি আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস না হয়; মানুষজন আপনাকে বিচার করবে, আপনাকে দেখে হাসাহাসি করবে, আপনাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিবে—এসব কারণে যদি আত্মপ্রকাশ করতে ভয় পান, তবে এই তিনটি অভ্যাস গড়ে তুলুন—

এক. আজ আপনি যেমন আছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ হোন। চোখদুটো খুলুন। নিজের মধ্যে থাকা নেয়ামতগুলো, মেধাটা দেখুন। কীভাবে আপনি ইতোমধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে প্রতিদিন কোনো না কোনো পরিবর্তন আনছেন—সেসব দেখুন। মনে আনন্দ লালন করুন। ইতিবাচক হোন, উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করুন। আর অবশ্যই, আল্লাহ্ আপনাকে যা নেয়ামত দিয়েছেন, সেসবের শুকরিয়া আদায় করুন।

দুই. নিজেকে ভালোবাসুন। অবশ্যই বাসতে হবে। এটা ঠিক, আগে আমাদের কেউ কখনো এমনটা বলেনি। কিন্তু আমরা এখন জানি, নিজেকে ভালোবাসা, নিজের যত্ন নেওয়া, নিজেকে সম্মান করা, কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কেউ বলার আগেই, আপনাকে কাজগুলো করার প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করা বন্ধ করুন—অন্যরা কী করে, কী বলে, তাদের জীবনটা কেমন, তাদের কয়টা ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে, তারা কীভাবে সন্তান লালনপালন করে, সবকিছু। আপনার দৌড়টা আপনিই দৌড়ান।

তিন. প্রতিটা দিনই উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচুন। মনোযোগী, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও আগ্রহী হোন। এটা আপনার জীবন। সুতরাং, আপনি ঠিক করবেন আপনার কী করা উচিত। উপভোগ করবেন না কি অপচয়? মেনে নিবেন না কি নষ্ট করবেন?

সেজন্য বলছি, আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিন—সৎভাবে, সম্পূর্ণরূপে, আল্লাহর পরিকল্পনায় ভরসা রেখে। তাই,

■ একজন নারী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করুন।

■ একজন কন্যা হিসেবে, একজন বোন হিসেবে, একজন স্ত্রী, একজন মা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করুন।

■ একান্ত নিজের মতো করে নিজেকে প্রকাশ করুন।

নিঃস্ব:

"আমার মনে হচ্ছে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।"

সামনে দাঁড়ানো বোনটার চোখের দিকে আমি তাকালাম। তার পরিচয়—সমাজের একটা ভিত্তি, একজন বাধ্য স্ত্রী, একজন ভালো মা, পাশপাশি স্থানীয় একটা বিদ্যালয়ের সকলের পছন্দের শিক্ষিকা। তারপরও তিনি সুখী ছিলেন না।

আমি তার কাছে জানতে চাইলাম—নিজের যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি কী কী করেন, নিজের ঝুলিতে কী কী পুরেছেন। তিনি আমার দিকে অসহায়ভাবে কয়েক সেকেন্ড তাকালেন, তারপর একগাল হেসে দিলেন। "অনেকদিন হলো, আমি নিজের জন্য কিছু করি না। এমনকি এখন তো আমি নিজের পছন্দ, অপছন্দও জানি না।"

সমাজে এমন স্ত্রী কিংবা মায়ের দেখা মেলা অসম্ভব নয়। অন্যের দেখভাল করতে করতে যখন বিরতিহীনভাবে আপনার দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে যাবে, তখন নিজের জন্য কিছু করার কথা ভাবাও দুঃসাধ্য। একবারের জন্যও সম্ভব না।

সত্যটা হলো, আমরা অনেকেই আমাদের মাকে দেখে বড় হয়েছি। সেই মা, যিনি নিজের ছাড়া বাকি সবার সেবা করতে প্রস্তুত। আমরা দেখেছি, আমাদের মায়েরা সন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য, সম্পর্কের জন্য নিজের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা কুরবান করেছেন। আমরা দেখেছি, আমাদের মায়েরা বিনা বাক্যব্যয়ে, সবার বোঝা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ সব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই শিক্ষাটা আমরাও পেয়েছি—সেবা করা মানেই আত্মত্যাগ। মা হওয়া মানেই নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া।

যতদিন না আমরা মায়েদের মতো রান্না, চলাফেরা, সাফসুতরা না করছি—ততদিন অব্দি আমরা বুঝতে পারি না ক্লান্তি, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বিরক্তি বলতে আসলে কী বোঝায়। আমরা এও জানতাম না, একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওপাশের মানুষটাকে আর চিনতে পারব না।

আমাদের অনেকের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণার আবাস—ভালো মুসলিম হওয়ার একটা মাত্র উপায় আছে। একটাই ছাঁচ, যার আদলে নিজেকে গড়ে নিতে হবে। যেখানে কোনো স্বতন্ত্রতা নেই, কোনো স্বীকৃতি নেই। আল্লাহ যে গুণাবলি আমাদের দিয়েছেন, তারও কোনো উৎযাপন নেই। স্রেফ একটা ফর্দ—

- বিনয়ী
- শান্ত
- গম্ভীর
- ঘরকুনো
- বাধ্য
- নত
- লাজুক
- অসার
- অনুসারী

জীবনের লক্ষ্যের কথা যদি ধরি, তবে কেবল তিনটি অর্জন—ভালো স্ত্রী, ভালো মা, ভালো পর্দানশিন নারী।

যদিও এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু, যাদের মধ্যে এই বিশেষ গুণগুলো নেই, ব্যাপারটা তাদের জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

- প্রাণবন্ত
- প্রবল
- বহির্গামী
- পেশাদার
- জেদি
- স্বাধীন
- আত্মবিশ্বাসী
- কর্মঠ
- দলনেত্রী

যদি বোনদের কোনো বৈঠকে গিয়ে আপনার মনে হয়, আপনি এখানে মানানসই না। কেননা, আপনি একটু বেশি বেশি করছেন, নয়তো অন্যদের চেয়ে আলাদা—তাহলে আপনি বুঝবেন, আমি কী বলতে চাচ্ছি।

আচ্ছা, এই ধারণাটা আমরা কোথায় পেলাম যে, কেবল একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মেয়েরাই সমাজে বসবাস করতে পারবে? যে নারী তার জায়গাটা জানে, যে তার অবস্থানকে সম্মান করে; যে খুশিমনে ডুবে যেতে পারবে, যে তার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ অবস্থান নিয়ে খুশি, যে নিজের চেয়ে অন্যকে বেশি গুরুৎব দেয়—তাকেই কেবল সমাজে গ্রহণ করা হবে।

এসব আমরা কোথায় পেলাম?

আমার কাছে এর কিছু উত্তর আছে।

সংস্কৃতি বরাবরই সমাজের হর্তাকর্তাদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেয়—এই প্রবণতাকে কিছুটা দোষ দেওয়া যায়। কিন্তু, আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে, নারীদের দুর্বল অবস্থান ও পুরুষদের অত্যাচারের জন্য দুর্বল পুরুষের (ও নারীর) অবদান অনেক। শুকরিয়া, যে জিনিসটা এখন পরিবর্তিত হচ্ছে। মুসলিম নারীদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা বদলাচ্ছে। আমরা এখন দম নিতে পারছি, ইসলামের মধ্যে থেকেই নিজেদের পথ খুঁজে পাচ্ছি। পাশাপাশি আল্লাহ আমাদের যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে নিজেকে গড়ে নিচ্ছি।

কিন্তু নিজের মতো করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে কী করা উচিত?

নিজের মতো প্রকাশ করার ব্যাপারটা সহজ শোনালেও বাস্তবে এত সহজ নয়। এর মানে—জোরালোভাবে নিজেকে স্বীকার করা, নিজেকে ভালোবাসা। দুনিয়ার কেউই আপনাকে ভালোবাসতে পারবে না, যতক্ষণ না আপনি নিজেকে ভালোবাসবেন।

নিজেকে ভালোবাসা:

নিজেকে কীভাবে ভালোবাসা যায়—সেটা আমাদের কেউ শেখায় না। আমরা অধিকাংশই বড় হয়েছি সমালোচনা পেয়ে, অন্যের সাথে তুলনা করে এবং শর্ত মোতাবেক ভালোবাসা পেয়ে। অনেক মা-বাবা তাদের মেয়ে সন্তানকে পারফেক্ট কন্যা, পারফেক্ট বোন, পারফেক্ট হবুবধূ হিসেবে তৈরি করতে চান। সেজন্য অনিচ্ছায় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন—লজ্জা, গঞ্জনা।

একজন বালিকা হিসেবে আপনাকে সবসময় বিভিন্ন করণীয় ও বর্জনীয় মেনে চলতে হয়—আচরণ, বাহ্যিক সৌন্দর্য, সম্ভাবনাসহ সকল ক্ষেত্রে। আমরা কখনো এমনটা শুনি না, "তুমি যেমন আছো তেমনই যথেষ্ট।" কেউ আমাদের শেখায় না, কীভাবে নিজেকে ভালোবাসতে হয়। এই শিক্ষাটা আমাদের নিজেদের শিখে নিতে হবে, যেমনিভাবে নারী হিসেবে আমরা হাঁটতে শিখি। আমাদের অনেকে এখনও সেটা শিখছি।

কিন্তু আপনি যদি এখনও নিজেকে তাচ্ছিল্য করেন, অন্যের সাথে তুলনা করেন, এখনও নিজেকে অনেক ছোটো ভাবেন—তবে নিজেকে ভালোবাসা খুব কঠিন। আকাঙ্ক্ষা এবং স্বীকার করার মধ্যে আমাদের সমতা করতে হবে। বড় লক্ষ্য স্থির করে, নিজের কমতিগুলো স্বীকার করতে হবে। এসব থাকা সত্ত্বেও নিজেকে ভালোবাসতে হবে।

কেননা, মাঝে মাঝে নিজের কড়া সমালোচক হলো, আয়নায় দাঁড়ানো নিজেরই প্রতিবিম্বটা। অপরদিকে, এই নারীটি আবার আপনার জীবনের সকল ব্যক্তির একটা সম্মিলিত রূপ। যে সেই ছোটোবেলা থেকে ভেতরের আপনাকে চেনে, আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে যার ধারণা আছে। আপনার ভেতরের আসল সত্তা সে। সে আপনার মস্তিষ্কের সেই আওয়াজ, যে সীমাবদ্ধ বিশ্বাসগুলো আপনার মস্তিষ্কে জিকিরের মতো গুনগুন করে, অন্যের সমালোচনাগুলো বারবার কানে বাজে। সে আপনাকে সেসব মিথ্যা কথাগুলো বলেছে, যা এতদিন ধরে আপনি সত্য বলে বিশ্বাস করে এসেছেন। যেমন;

আপনি কখনোই যথেষ্ট ভালো হতে পারবেন না।
আপনি একটা উটকো ঝামেলা।
আপনি একটা হারু পাবলিক।

অতীতে আপনি যতবারই হেরে যান না কেন, যত বেশি ভুলই করেন না কেন, যতবারই পা পিছলে পড়ে যান না কেন—তাতে কিছু যায়-আসে না। প্রতিবারই আপনার একটা পছন্দ ছিল—নিজের গল্পটা কীভাবে বলবেন, আপনার মন সেটা কীভাবে মনে রাখছে। যদি আপনি ভুক্তভোগী হওয়াকে বেছে নেন, তবে আপনার পুরো মনোযোগ ছিল—কীভাবে আপনি গন্ডগোলটা পাকিয়েছেন, কীভাবে পুরোটাই আপনার দোষ ছিল এসবে।

যদি আপনি নায়ক হওয়াকে বেছে নেন, তাহলে আপনার পুরো মনোযোগ হবে—কোন কাজটা আপনি সঠিক করেছেন। এর ফলস্বরূপ আপনার সাথে কী কী ভালো হয়েছে, আপনি কতটা শিখেছেন।

ব্যাপারটা হলো, আমরা ভুলে যাই আল্লাহ আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। শত কমতি, ভুল, অক্ষমতা, হারের মধ্যেও আমরা সুন্দর।

এটা এমন যেন আমরা ভুলে গিয়েছি, আল্লাহ আমাদের মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা, জ্ঞান দিয়েছেন। যেন আমরা বেড়ে উঠতে পারি।

যেন আমরা ভুলে গিয়েছি, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

অনেকে হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন—আমাদের সৃষ্টি করার পেছনে স্বতন্ত্র সেই উদ্দেশ্যটা কী? মহা-মহিম আল্লাহ কুরআনে সেটা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

> "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সুরা যারিয়াত: ৫৬)

সোজাসাপটা জবাব, তাই না?

আর ইসলামে ইবাদতের সৌন্দর্য, কী বলব!

এটা কত চমৎকার। ইবাদতকে শরীর, মন এবং মস্তিষ্কের সামগ্রিক দিক থেকে কল্পনা করাটা কত বড় নেয়ামত। ইবাদত মানে স্রেফ নবিজি সা.-এর শেখানো কিছু আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ না। বরং প্রতিদিনের প্রতিটি কাজ সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে করলে তাও ইবাদত বলে গণ্য হবে।

প্রতিদিনের কাজগুলো, প্রতিটি চরিত্রে পালন করা আপনার কর্তব্যগুলোও ইবাদত হতে পারে। সে আপনি যে-ই হোন—ছাত্রী, মালকিন, মা, স্ত্রী কিংবা কর্মজীবী। নিত্যদিনের কাজগুলো সঠিক উদ্দেশ্যে করলে, সেটাও ইবাদত হতে পারে—মনজিল পাঠে যেমনটা আলোচনা করেছি।

সুতরাং মনে রাখবেন, জীবনের যে ধাপে বা যে চরিত্রেই থাকুন না কেন—নায়ক হিসেবে, বিজয়ী হয়ে, নিজের মতো আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন।

আল্লাহ আপনাকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন:

এই পৃথিবীতে কেবল একটাই আপনি আছেন। পুরো সময়টাজুড়ে একটা আপনিই ছিলেন এবং আজীবন থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে স্বতন্ত্র নেয়ামত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

পাশাপাশি যে উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পুরো সম্ভাবনাও আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

আপনার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবনের গল্প, পরিস্থিতি—সবটাই ভিন্ন, স্বতন্ত্র। এসব আপনাকে আজকের 'আপনি'তে পরিণত করেছে। হ্যাঁ, শত পরীক্ষা, ব্যর্থতা, কমতি সত্ত্বেও। সবগুলো বৈশিষ্ট্য আপনাকে এমন এক নারীতে পরিণত করেছে, যা আপনি এখন আছেন। সেই নারী, যে আপনার ভাবনার চেয়েও বেশি শক্তিশালী, আপনার চিন্তার চেয়েও বেশি সাহসী, আপনার কল্পনার চেয়েও ঢের সক্ষম।

তাই তাকে সেভাবেই থাকতে দিন।

অন্য কারো সাথে নিজেকে তুলনা করবেন না। অন্য কারো ছাঁচে নিজেকে গড়বেন না। অন্য কারো আদলে নিজের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন করবেন না একদমই।

অন্যকে দেখে অনুপ্রাণিত হোন। কিন্তু কেবল সেসব ক্ষেত্রে, যেসব আপনাকে সাহস জোগায়, আরো জ্বলে ওঠার আলো দেখায়। কেননা, আপনার আলো, আপনার কাছে স্বতন্ত্র।

ভাবনার খোরাক: এখন, আপনার কাছে একটা পছন্দ আছে। হয় আপনি অন্য কারো অনুরূপ হবেন, অন্য কারো অভিজ্ঞতার আলোকে তার ছায়া হবেন, তার পথে তার অনুসারী হবেন। নয়তো নির্ভীকভাবে চলবেন—নিজের আলাদা কণ্ঠ, আলাদা মেধা, আলাদা কাজ নিয়ে।

আপনার স্বজাতি খুঁজে বের করুন:

যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য এই কথাটাই যথেষ্ট যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের খেয়াল রাখবেন। সেদিন আল্লাহ বলবেন,

> 'আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া প্রদান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।' (মুসলিম)

আমার জীবনে ইসলাম যে নেয়ামতগুলো বয়ে এনেছে, তার একটি হলো বোনদের সাথে সখ্য তথা নারীবন্ধু। এসব আমি সবিস্তারে *ফ্রম মাই সিস্টার্স লিপস* বইতে বলেছি। এখানে সেটা আমি আবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

সেখানে আমি দ্বীনি বোনের সম্পর্কটা এভাবে বর্ণনা করেছি—এটা বিশেষ কিছু। আমি এতে সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছি। এটাতে অহমিকা নেই, হিংসা নেই; বিদ্বেষ, ঈর্ষা কিংবা অহংকারেরও কোনো জায়গা নেই। এটা পবিত্র ও আত্ম অহমিকা বিবর্জিত। এটা পৃথিবীর ঊর্ধ্বে, অদ্ভুত সুন্দর একটা সম্পর্ক।

যখন আমি প্রথমবার দ্বীনি বোনদের সম্পর্কে বলেছি, তখন থেকে হাজারো বোনের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। স্বর্গীয় আদর্শগুলো মেনে চলতে, সবার মতো আমিও জীবনে নানান উত্থানপতনের সম্মুখীন হয়েছি। সবসময়, সবকিছু আমাদের নাগালে থাকে না, তাই না? হয়তো আপনি কোনো দ্বীনি বোনের থেকে কষ্ট পেয়েছেন, নয়তো প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কখনো বা সেই দ্বীনি বোনদের হাতেই হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়েছে। হয়তো আপনাকে নিয়ে কানাঘুষো হয়েছে, অপবাদ দিয়েছে, কিংবা আপনার নামে কালিমা লেপন করা হয়েছে। এমনও হতে পারে, আপনার বোনেরা আপনাকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দেয় না। উলটো আপনার কাজগুলো বিচার করে। নয়তো, অধিকাংশ বোন আপনার মতন না।

আপনার অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন—আমি আপনাকে বলছি, আপনার একটা স্বজাতি খুঁজে বের করুন।

"তাহলে, আমার স্বজাতি কোনটা?"—জি! আপনার প্রশ্নটা আমি শুনেছি।

আপনার স্বজাতি হলো সেই বোনেরা, যারা আপনাকে আরো উপরে তোলে, আপনাকে প্রতিনিয়ত সমর্থন করে, বড় হতে শেখায়—একজন বিশ্বাসী হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে। আপনি কাকে সময় দিচ্ছেন, কার সাথে মিশছেন, কে আপনাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে—সেটা বাছাই করার অধিকার আপনার আছে।

আপনার স্বজাতিকে খুঁজে বের করুন। তারা এখানেই আছে—সেই বোনেরা, যারা মনে করে, আপনি যেভাবে আছেন সেভাবেই অসাধারণ। যখন আপনি কিছু একটা করতে চাচ্ছেন, তখন যারা আপনাকে উৎসাহ দেয়, আপনার জন্য সময় রাখে।

সেসব নারীদের খুঁজে বের করুন, তাদের সাহচর্য উপভোগ করুন।

পাশাপাশি, আপনি নিজেও সেই বোনটা, সেই বন্ধুটা হোন—যাকে আপনি সহচর হিসেবে পেতে চান। অন্য বোনের মধ্যে যে গুণগুলো দেখতে চান, সেগুলো

নিজের মধ্যেও তৈরি করুন। তাদেরকে আপনার জীবনের একটা অংশ বানিয়ে নিন। আপনার আলোটা অন্যদের দিন, যেন তারা আলোকিত হতে পারে। তাদেরকে মোটেও দেবেন না, যারা এটাকে হুমকি মনে করে।

আপনার বান্ধবীরা কীভাবে আপনার ওপর প্রভাব ফেলছে, সেটা দেখুন। নিচের প্রশ্নগুলো নিজেকে করতে পারেন—

- এই বোনটার সাথে সময় কাটাতে আমার কেমন লাগে?
- আমরা একসাথে যে কথাগুলো বলি, সেগুলো আমার ভালো লাগে?
- তার সাথে থাকলে আমি নেকি কামাই, না কি উলটোটা?
- সে আমাকে সমর্থন দেয়?
- আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি?
- আমি পা হড়কে পড়ে গেলে সে আমাকে টেনে তুলবে?
- এই সম্পর্কটার ফলে আমি আরেকটু বেড়ে উঠেছি?
- আমি আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবাসি?

ভাবনার খোরাক: কোনো একটা বন্ধুকে কল্পনা করুন, যে আপনার সম্পর্কে ঠিক এই প্রশ্নগুলো নিজেকে করছে। তবে তার উত্তরগুলো কী হবে?

কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন?

প্রিয় পাঠক, এই আলাপটা আমি আবার কেন আনলাম, তার একটা কারণ আছে। সেটা হলো—আপনার কেবল নিজের ওপর কর্তৃত্ব আছে, অন্য কারো ওপর না।

- যদি আপনি জীবনে সুখী হতে না পারেন, তাহলে সুখী হওয়ার জন্য আপনার বাহ্যিক আচরণে ও পরিস্থিতিতে কী কী পরিবর্তন এনেছেন?
- যদি আপনার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার দশা হয়। তবে তার কারণটা বুঝতে, নিজের আচরণ পরিবর্তন করতে এবং সেটা ঠিক করতে আপনি কী করেছেন?
- যদি আপনার সন্তানরা নাটকবাজ হয়, উৎসন্নে যায়; তবে সেসবের মূল কারণ খুঁজে বের করতে, তা সমাধা করতে আপনি কী করেছেন?

▪ যদি আপনার ব্যবসায় ভেস্তে যায়, তাহলে আপনার চিন্তাভাবনা আর পদ্ধতিতে কী পরিবর্তন এনেছেন?

▪ যদি আপনার বন্ধুত্ব হয় অগভীর এবং অসম্পূর্ণ; তবে, আপনার স্বজাতি খুঁজে পেতে আপনি কী করেছেন?

▪ যদি আপনার সমাজটা ভেঙে পড়ে, তাহলে সেটাকে জোড়া লাগাতে আপনি কী করেছেন?

অন্যভাবে বললে, আপনার জীবনের যে অংশটা ঠিকভাবে কাজ করছে না, সেখানে আপনি কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন?

নিজের শৈশব কিংবা যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, আমাকে তাদের কথা বলবেন না। আমাকে আপনার স্বামীর কথা বলবেন না, যে আপনার কথা শুনে না, যে জীবনেও পরিবর্তন হবে না। আমাকে আপনার সন্তানদের কথা বলবেন না, যারা আপনাকে সম্মান করে না। আমাকে আপনার ব্যবসায় নিয়ে বলবেন না, আজকের পরিস্থিতিতে ব্যবসায় করা কত কঠিন, সেসবও না। আপনার বন্ধুদের সম্পর্কে আমাকে বলবেন না, তারা কতটা হিংসা করে আপনাকে। আর আপনার সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আমাকে বলবেন না।

আমি স্পষ্টভাবে বলছি—সবগুলোই পরীক্ষা; সোজা এবং সহজ উত্তর। চলতি পথে পড়ে থাকা ইটসুরকির মতো এগুলো। গল্পের বইয়ে থাকা নায়কেরা যেমন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, তেমনি।

আল্লাহ আমাদের জন্য এই বাধাগুলো, এই পরীক্ষাগুলো নিজে পছন্দ করেছেন। এখানে আমাদের পছন্দ করার সুযোগ নেই। কিন্তু আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব, সেটা আমাদের হাতে। এটাই সবচেয়ে স্বাধীন এবং শক্তিশালী বিশ্বাস। আমাদেরকেই সেটা বেছে নিতে হবে।

জীবনের পরিস্থিতিগুলোতে আমরা ভুক্তভোগী হব না কি বিজয়ী?

ভয়, সন্দেহ, অজুহাত, দোষ এসবের আড়ালে আমরা নিজেকে লুকিয়ে রাখব, না কি একজন নায়কের মতো আত্মপ্রকাশ করব?

যখন আমি এভাবে কথা বলি, অনেকে মনে করেন আমি বেশি ন্যাকামি করছি। মোটের ওপর, আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাই, তাই না? আমরা সবাই মানুষ, যে তার কাজগুলো শেষ করতে চায়। আমরা নিয়তিতে বাধা নই। আমি এটাকে অন্যভাবে দেখতে চাই।

আমার জীবন; একটা মহাকাব্য:

আমি বিশ্বাস করি যে, আমার জীবন একটা মহাকাব্য। বিশ্বজগৎ, এই পৃথিবী এবং তাতে বসবাস করা বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের কথা চিন্তা করলে আমার মনে হয়—আমি গুরুত্বপূর্ণ। আমিও আশ্চর্যজনক কিছু।

কিন্তু আল্লাহ সকল বাস্তবতাকে একত্র করতে সক্ষম।

এটা আমি বুঝেছি যখন হজে গেলাম তখন। যেখানে হাজার হাজার হজযাত্রী হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করছে, সেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নিজের গুরুত্ব বোঝা খুব সহজ।

কিন্তু একই সাথে আল্লাহ আপনার দুআ শুনছেন। আর সেটা তাঁর কাছে মহা মূল্যবান।

সুতরাং, জনতার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতেও যদি আপনি ফিসফিসিয়ে কিছু বলেন, সেটাও মূল্যবান। কেবল সেই শব্দ বা দুআগুলো যে মূল্যবান তাই নয়, দুনিয়ার রবের কাছে আপনার অন্তরটাও বহু মূল্যবান।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবুন, সত্যটা উপলব্ধি করুন। একইসাথে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দঘন মুহূর্ত।

আমার জীবনটা আমি কেমন দেখতে চাই সেটা—আল্লাহ আমার জন্য সবটা ঠিক করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে পরীক্ষা করছেন, সংকেত দিচ্ছেন। আমি; একটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, যে পাপে পূর্ণ। তারপরও তিনি প্রতিনিয়ত নিয়ামতরাজি দিয়ে যাচ্ছেন, জনগণের সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন। বেড়ে ওঠা এবং প্রতিদান লাভের সুযোগ দিচ্ছেন।

আর তিনি আপনার জন্যও এমনটা করেন। দিনের পর দিন, প্রতিদিন।

সুতরাং নিজের জীবনটাকে বিরাট কিছু ভাবতে, একটা সুন্দর যাত্রা হিসেবে গণ্য করতে, আপনাকে কে বাধা দিচ্ছে?

আমাদের সবার যাত্রাটাই যদি হয় আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার, তাহলে সবার পথ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক না?

সুতরাং যদি আপনি আমার কথাগুলো মেনে নেন যে, আপনার জীবনটা একটা মহাকাব্য এবং আপনার জীবন একটা যাত্রার ন্যায়; তবে আপনাকে বাছাই করতে হবে; ভুক্তভোগী হয়ে থাকবেন না কি নায়ক হবেন। আপনাকে যেকোনো একটা পছন্দ করতেই হবে।

যদি আপনি নায়ক হওয়াকে বেছে নেন, তবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে—জেতার জন্য, শেখার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য, অনুতপ্ত হওয়ার জন্য, সেবা প্রদানের জন্য, জ্বলে ওঠার জন্য, সফল হওয়ার জন্য।

কেননা, আল্লাহ সবসময় আপনার পক্ষে কাজ করছেন। যদিও মাঝে মাঝে এমনটা মনে নাও হতে পারে।

যখন আপনি জানবেন যে, নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই আপনাকে দেওয়া হয়েছে; তখন আপনাকে যা করতে হবে—নিজের পরিচয় দাবি করতে হবে। সাথে ভরসা করতে হবে আল্লাহ আপনার সাথে আছেন।

দেখবেন, বাকিটা এমনি এমনি হয়ে যাবে।

* * *

যাত্রা অন্তিমে

বইয়ের শুরুতেই আমি বলেছি, আত্মপ্রকাশ নবিজি সা.-এর একটি সুন্নাহ। এবার আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন, আমি যা যা বলেছি তার সব কয়টা বৈশিষ্ট্য নবিজির মধ্যে ছিল—লক্ষ্যের প্রতি আন্তরিকতা, ইতিবাচকতা, সন্তুষ্টি, সাহসিকতা, সততা।

এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনাকে কী করতে হবে? আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহ আপনার জয়ের জন্য যা যা চ্যালেঞ্জ রেখেছেন সেসব মোকাবিলা করতে হবে। এটা মনে রাখবেন, আল্লাহ সবসময় সাথে আছেন। আপনাকে আপনার গল্পের নায়ক হিসেবেই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

আমাদের সবার জীবনেই উত্থানপতন আছে। হিরোরাও ব্যতিক্রম নয়। ইসলামের চারজন মহৎ নারীর কথাই ভাবুন—খাদিজা, আয়িশাহ, আসমা, ফাতিমা।

কারো জীবনটাই সুখকর ছিল না। কেউই সবকিছু চাওয়ামাত্র পাননি। বরং, প্রতিনিয়ত তাঁদের পরীক্ষা করা হয়েছে।

- তালাকপ্রাপ্তা
- বিধবা
- বন্ধ্যাত্ব
- দরিদ্রা
- অন্যায়
- হারানো

তারপরও, আমরা তাদের মজলুম হিসেবে জানি না, বরং আমরা তাদের আদর্শ হিসেবে মনে রাখি। আপনিও তার ব্যতিক্রম নন। তাই নিজেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিন।

সে-ই নায়কটা হোন, যার জন্য আপনার জন্ম হয়েছে।

একটি শেষ স্বপ্ন দেখুন:

কল্পনা করুন, আপনার চারপাশে ঘিরে বসেছে সন্তান, নাতিপুতিরা। আপনি তাদের নিজের জীবনের গল্প বলছেন...

কোন গল্পটা বলবেন তাদের?

- জীবনের বাধাবিপত্তিগুলো পার হয়ে কী শিখলেন, সেটা বলবেন?
- আল্লাহর ওপর নির্ভর করে কীভাবে প্রতিকূলতাকে কাটালেন, সেটা বলবেন?
- যখন ইমান নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল, তখনও আপনি বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ আপনার ভালো চান—সেই গল্পটা বলবেন?
- প্রচণ্ড কঠিন মুহূর্তেও আপনার অন্তরের ভেতর ভরসা ছিল–আল্লাহ আপনাকে ভেঙেচুরে দেবার জন্য এই পরীক্ষায় ফেলেননি, সেটা বলবেন?

এই জীবনটা আপনাকে এমনি এমনি শেষ করে দেওয়ার জন্য তৈরি না। বরং আপনাকে নতুন করে তৈরি করতে, আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি প্রাণবন্ত করতে সৃষ্ট। আপনাকে এমন এক নায়ক বানাতে, যা আপনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি।

আপনি তাদের দেখাবেন, কীভাবে নিজের জীবনের নায়ক হতে হয়?

- পড়ে গেলে আবার কীভাবে উঠে দাঁড়াতে হয়?
- কীভাবে আল্লাহকে ডাকতে হয়?
- কীভাবে ভরসা করতে হয়?
- কীভাবে নিজেকে বিশ্বাস করা যায়?
- কীভাবে হিরো হওয়া যায়?

আমি জানি, আপনি করবেন ইন শা আল্লাহ।

আদর্শ মুসলিমাহ হওয়ার এই যাত্রায়, মহীয়ান আল্লাহ আপনার সহায় হোন। যে অবদান সমাজে রাখার জন্য আপনার জন্ম হয়েছে, সেটা পূর্ণ করার তাওফিক দিন। আমিন।